সোপর্দ

বুদ্ধদেব গুহ

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

ভারতবর্ষের কোটি কোটি
গ্রামীন সুরাই সুরা আর সনাতন আঁকুড়াদের উদ্দেশ্যে,
আন্তরিক গ্লানি ও লজ্জার সঙ্গে।

এই লেখকের অন্যান্য বই

কাঙ্গপোকপি
ঋভু
সাজঘরে, একা
সবিনয় নিবেদন
কোজাগর
স্বগতোক্তি
ধুলোবালি
মহুয়া
পারিধী
সোপর্দ
চবুতরা
প্রথম প্রবাস
পঞ্চম প্রবাস
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
বুদ্ধদেব গুহর শ্রেষ্ঠ গল্প
বনবাসর
দূরের ভোর
জঙ্গল মহল
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
যাওয়া-আসা
ঝাঁকিদর্শন
প্রথমাদের জন্যে
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
বিন্যাস
দু নম্বর
অ্যালবিনো
নগ্ন নির্জন বাতিঘর
মহুলসুখার চিঠি
পারিজাত পারিং

বুদ্ধদেব গুহর প্রেমের গল্প
অভিলাষ
চানঘরে গান
বাজা তোরা, রাজা যায়
আলোকঝারি
অজগরের দেশে

ইল্মোরাণ্দের দেশে
পঞ্চপ্রদীপ
খেলা যখন
ঋভুর শ্রাবণ
টাঁড়বাঘোয়া
গুগুনোগুম্বারের দেশে
মউলির রাত
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ওয়াইকিকি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
নাজাই
পলাশতলীর পড়শী
ভাবার সময়
ভোরের আগে
ইলিশ
দূরের দুপুর
মহুয়ার চিঠি
শালডুংরি
সন্ধের পরে
সাসানডিরি
পুজোর সময়ে
জেঠুমণি এণ্ড কোং
ল্যাংড়া পাহান
রুআহা
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
বাংরিপোসির দু'রাত্তির
পহেলী পেয়ার
মাধুকরী
অন্বেষ
হাজারদুয়ারা
নিনি কুমারীর বাঘ
বনজোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে

। ১ ।

॥ ১ ॥

এখন চারদিকেই রেঁায়া রেঁায়া কাছিমপেঠা পাহাড়ের সারি। কিন্তু একসময় নাকি এ অঞ্চলে অত্যন্ত ঘন অরণ্য ছিল। এ রাজ্যের রাজাই এই এক-কামরার বাংলোটি বানিয়েছিলেন শিকারের জন্যে। রাজার রাজত্ব চলে যাবার পর আদিবাসীরা চারদিকের এই সমস্ত পাহাড়কে বন-শূন্য করে ফেলেছে।

গাছ-গাছালি তেমন না থাকলে কী হয়, সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই এই সব ন্যাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চারদিক থেকে হাতীর দল নেমে আসে ধান ক্ষেতে।

এখন হেমন্ত। ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের রঙ লালচে হয়ে উঠেছে। বাংলোর পথের সমান্তরালে একটি লাল মাটির পথ চলে গেছে দূরের গাঁয়ে। ঝোপঝাড়; ক্বচিৎ শাল, সকালের মিষ্টি শীতে চিকন-পাখির ডাকের চমকে এক চিত্রকল্প গড়ে উঠে পরমুহূর্তেই অবহেলায় এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে।

পীচ রাস্তা ধরে বাঁদিকে গেলেই নাকড়া। সেখান থেকে ঝামরার পথ বেরিয়ে গেছে চন্‌সর হয়ে। আর ডানদিকে গেলে হলুদ পাহাড় হয়ে হাতীঝোড়া!

কাল ঠিক সন্ধ্যেবেলা বাস থেকে নেমেছে রাজীব আর মনু। এখানে যে আসবে, এবং থাকবে, এসব কিছুই আগে ঠিক করে আসেনি ওরা। প্রতি বছর একবার করে দিন সাতেকের জন্যে বেরিয়ে পড়ে ছেলেবেলার দু বন্ধুতে। বছরের ঠিক এই সময়টিতেই।

ঝাড়সুগুদাতে এসেছিল পরশু বিকেলে। কাছাকাছি নির্জনে কোনো থাকার জায়গা পায়নি। হোটেলে হয়ত থাকতে পারত, কিন্তু সেসব হোটেলের সামনে কলকাতারই মতো ভিড়-গিসগিস, ডিজেলের ধেঁায়া এবং আওয়াজ। সে কারণে কাল দুপুরে খেয়ে দেয়ে রাগ করেই এই

অচেনা পথের বাসে উঠে পড়েছিল ওরা দুজন। বাসটা এসে এখানেই থেমে গেল। যে-মোড়ে বাসটা থামল, তার কাছেই ছিল এই ছোট্ট বাংলোটি। এখানে কেউই আসে না মনে হলো। খালিই পাওয়া গেল। পুলিশের চেকপোস্ট আছে পীচ রাস্তার উপর। তারই কাছাকাছি, ডানদিকের লালমাটির রাস্তাতে থ'না। উল্টোদিকে দারোগার কোয়ার্টার, দু-একটি ঘরবাড়ি।

বাংলোটি এক কামরার। কিন্তু ভালো। তবে খাওয়া-দাওয়ার কোনই বন্দোবস্ত নেই। চেকপোস্টের গায়ে-লাগানো ছোট্ট দোকানটিতে লাল চালের মোটা মিষ্টি ভাত, আর তার সঙ্গে নুন, তেল এবং কলাভাজা দিয়ে খাওয়া সেরেছিল ওরা রাতে। ডাল পর্যন্ত ছিল না। তবে দোকানি কথা দিয়েছে, যে আজ দুপুরে ডালের বন্দোবস্ত করবেই।

চারটে লাঠি-বিস্কুট শেষ করে, দু কাপ চা-নামক গরম জল গলায় ঢেলে একটা লাঠি-বিস্কুট বাংলোর বেসরকারি চৌকিদার, কালো একটা ল্যাংড়া কুকুরকে খেতে দিয়ে, সরকারি চৌকিদার মারফৎ মন্নুর জন্যে আবার চা আনতে পাঠিয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে দূরে চেয়ে রাজীব বসেছিল বারান্দার এক কোণায় চেয়ার পেতে।

রাজীবের একটা মনোহারী দোকান আছে ঢাকুরিয়াতে। খুব চালু দোকান। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যপ্রীতি ছিল ওর। লেখা-টেখার শখও ছিল। কিন্তু ও অন্য কোনো সাবজেক্টেই বিশেষ ভালো ছিল না। সাধারণ ভাবে বি এ পাশ করে শুধুমাত্র সাহিত্য ভাঙিয়ে কিছুই করতে না পেরে, পাড়ার এক বন্ধুর বাবাকে বলে তাঁদের গাড়িহীন—গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে, বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বেশ কিছু টাকা আর মায়ের দুটি মোটা সোনার বালা বিক্রি করে, ব্যবসা বেশ ভয় ভয়েই শুরু করেছিল। ব্রয়লার চিকেন, ডিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং আরো নানা জিনিস রাখে ও দোকানে। মাড়োয়ারী কি পাঞ্জাবী ফার্মে কেরানিগিরি করে যা পেতে পারত, তার চেয়ে বহুগুণ বেশিই রোজগার করে এখন। তবে সারাদিন বড়ই কথা বলতে হয়; মুখ শুকিয়ে যায়। নানারকম

লোকের সঙ্গে, হাসিমুখে নানা অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর কথা। তাই রাজীবের কাছে, কথা না—বলাটাই সবচেয়ে বড় ছুটি। ও অনেক-কিছুই ভাবে এই সময়ে। পাড়ার মোড়ের ওনারশিপ মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটের যাদবপুর য়্যুনিভার্সিটিতে এম এ পড়া সুন্দরী মেয়েটি, যার নাম শুক্লা—তার কথাই ভাবছিল এই সকালে। শুক্লা রাজীবের হবে না কখনও। শুক্লা নিশ্চয়ই টাইপরা, হাতে ব্রিফকেস ঝোলানো কোনো কোম্পানী-এক্জিকিউটিভ্ বিয়ে করবে।

কোন্ অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা, বিদুষী মেয়ে আর মনোহারী দোকানের দোকানিকে স্বামী করতে চায়! দোকানদার স্বামীর পরিচয় কি একটা পরিচয়? বাঙালী চিরদিনই চাকরদেরই কদর করেছে, মালিকদের নয়। ব্যবসাদারদের এখনও হেয় করা হয় কোলকাতায়।

অথচ রাজীব অনিরুদ্ধদেরও চেনে। অনিরুদ্ধ যাদবপুর থেকে সিভিল এনজিনীয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। চাকরি করবে না পণ করে ঠিকাদারিতে নেমেছিল। তারপর ঘুষ-ঘাসের বহর দেখে ঠিকাদারি ছেড়ে দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ফুটপাতে মাটন্-রোলের স্টল করেছে। মরদের বাচ্চা! বিয়ে করেছে পুরনো বন্ধু চুমকিকে। চুমকি একটা কলেজে পড়ায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঁচে থাকলে ওর পিঠ চাপড়াতেন। হয়তো রাজীবেরও।

তবে ব্যবসাতে বড় ঝামেলা। আজকাল ছোট-বড় সব ব্যবসাই মহা ঝকমারির। কালকেই রাতে মনু গল্প করছিল ওর মালিকের কথা। গুজরাটি। বিরাট ব্যবসাদার।

উনি দিল্লী গেছিলেন তদ্বির করতে। কদিন আগে বিদেশে এক কোটি টাকার মাল বিক্রি করার পর একটা বিশেষ আইটেম ব্যান করে দেওয়ায় খুবই বিপদে পড়েছেন। কনট্রাক্ট হয়ে গেছে, ডেলিভারি হয়নি এখনও। মাল না-দিতে পারলে বিদেশী ক্রেতা ড্যামেজ স্যুট ঠুকে দেবেন। তাই দিল্লীতে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, মিনিস্টারের খুবই পেয়ারের একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে।

মিনিস্টার বলেছিলেন; সব ঠিক হো যায়গা। দু মাসেও যখন কিছুই ঠিক হলো না, তখন একজন জাঁদরেল এম-পি-র কাছে গেছিলেন পারেখ সাহেব, আবারও মুরুব্বী ধরে, গত সপ্তাহে। গিয়ে হাত জোড় করে বলেছিলেন, দেখুন স্যার, ইট ইজ অ্যা ম্যাটার অফ ন্যাশনাল ইন্টাররেস্ট। দেশের এক কোটি টাকার ফরেন এক্সচেঞ্জ লস হবে। আইটেমটা ব্যান করেছেন করেছেন; কিন্তু যে-মালটা অলরেডি বিক্রি করে ফেলেছি, সেটা অন্তত পাঠাতে দিন কৃপা করে।

সেই নেতা তাঁকে অতি হিতার্থীর মতো সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "মিস্টার পারেখ, ডোণ্ট টক অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন ডেল্লী। পিপল উইল কনসিডার উ্য টু বী অ্যা ফ্রড। অ্যা টোটাল ফ্রড।"

সেই মহান নেতা বলেছিলেন, তার চেয়ে এক কাজ করুন। কাল দু লাখ টাকা নিয়ে আসুন; আমি পঁচিশ জন এম-পিকে সঙ্গে করে কনসার্নড্ মিনিস্টারের কাছে যাচ্ছি—দশ মিনিটেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। এখন সব কাজই হয় ইম্পেটাস-এ। পার্সোনাল ইন্টারেস্টে। ন্যাশানাল ইন্টারেস্টে কোনো কিছুই ঘটে না। বুঝেছেন!

মনু একেবারে চান-টান সেরে জামাকাপড় পরে বারান্দায় এল। এসেই রাজীবের দিকে চেয়ে বলল কি রে? একা বসে হাসছিস যে! বাথরুমে গান গাওয়াটা ব্যক্তি স্বাধীনতারই অভিব্যক্তি। যেমন গানই গাই না কেন! তোর হাসবার কি তাতে? আমি কি এমনই গাই যে, সে গান শুনে তোর সব সময় শুধু হাসিই পায়।

রাজীব বলল, তোর গান শুনে নয়, কালকে তুই যা বলছিলি—তোর মালিকের রাজধানীর অভিজ্ঞতার কথা, তাই-ই ভাবছিলাম। কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল।

হাসি পেল? মনু বলল।

তারপর বলল, আমার হাসি পায় না। কারণ আজ দেশে গাইয়ে নন, বাজিয়ে নন, আঁকিয়ে নন, বিদ্বান নন, সাহিত্যিক নন, এই সব লোকগুলোই ভি-আই-পি। স্টেশানের, এয়ারপোর্টের সব ভি-আই-পি

লাউঞ্জ শুধুমাত্র এদেরই ব্যবহারের জন্যে। খবরের কাগজেও শুধু এদেরই ছবি, খবর। যে-যখন চেয়ারে, তাকে-তখন খুশী রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা! দেশটাকে চেটে-পুটে হামলে কামড়ে শেষ করে ছিবড়ে করে দিল, এই নেতারা মিলে। কিন্তু কারোরই কিছু বলবার নেই। জনগণের নাম করে জনগণের এমন সর্বনাশ বোধ হয় ভারতবর্ষেব ইতিহাসে কোনো ঠগী-ঠ্যাঙাড়েরাও করেনি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো? একটা লোকও প্রতিবাদ করে না—? একজনও মাথা তুলে দাঁড়ায় না—সমস্ত জাতটা একটা ক্লীবের জাত হয়ে গেল বে! হাণ্ড্রেড-পার্সেন্ট ইন্‌অ্যানিমেট।

রাজীব আস্তে আস্তে বলল, শোন মন্নু, তোর মালিকের অভিজ্ঞতা যেন দশ-কান করিস না। বড় বড় নেতা বলে কথা। পার্লামেণ্টারী প্রিভিলেজ কমিটি হয়তো ডেকে নিয়ে গিয়ে জবাবদিহি চাইবে; তারপর জেলে পুবে দেবে।

তাদেব নিজেদের আত্মসম্মান বা চক্ষুলজ্জা কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হয়ত করবে না। করলে নিজেদেব লজ্জা ও অসম্মান শুধু বাডবেই। তাছাড়া, দিলে দেবে। কি আর করা যাবে? এদেশের জেল তো নিবপরাধদেব জন্যেই বানানো হয়েছে। অত ভাবলে চলে না।

একটু চুপ করে থেকে রাজীব নিজেই পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলল, বেশ তো আছ! হপ্তায় একটা করে সিনেমা দেখছ, মালতীব সঙ্গে প্রেম করছ, এই বাজারেও উইলস্‌ ফিলটার খেয়ে যাচ্ছ,—কেন খামোখা দেশের মামলায় নিজেকে ফাঁসাচ্ছ মানিক? যে দেশ-এর বাপ-মা নেই, রক্ষকবাই ভক্ষক, দিল্লীভর্তি তক্ষক, সেখানে তুমি কে হে হরিদাস?

তারপরই বলল, কোন অধিকারে তুই আমার শান্তি ভঙ্গ করছিস বল্‌ তো? কলকাতাকে ভুলতে আমবা বেড়াতে এসেছি কি দিল্লীকে সঙ্গে করে?

মন্নু লাঠি-বিস্কুট কামড় দিয়ে উদাস গলায় বলল, সরি। ঠিকই

বলেছিস। আর ওসব কথা নয়। এ কদিন একেবারে লাফাঙ্গার মতো ঘুরে ফিরে বেড়াব। চল্, তুই চান করে নে ; তারপর দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে বেরোই। আহা ! রোদটা কী মিষ্টি লাগছে বল তো !

কলকাতায় এখনও পাখা চলছে বাঁই-বাঁই করে নিশ্চয়ই।

—সে আর বলতে !

॥ ২ ॥

মন্নু সঙ্গে থাকলে ওড়িশার কোথাও ঘুরে বেড়ানো কোনো প্রবলেম নয়। ওর ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশাতেই। কটকের মামাবাড়িতে। পনেরো বছর অবধি। তারপর কলকাতা এসেছে মামার মৃত্যুর পর। খুব ভাল ওড়িয়া বলে। ওর কথা শুনলে কেউ ধরতেই পারবে না যে, ওড়িয়া ওর মাতৃভাষা নয়।

রাজীব পায়জামা-পাঞ্জাবী পরেছে তেল মেখে, চান করে। পায়ে কাবলী। কাঁধে ক্যামেরা। মন্নু জিনস পরেছে, সঙ্গে লাল গেঞ্জী। চেহারাটা মন্নুর বেশ ভালোই। মালতীকে প্রায় গেঁথেই তুলেছে। মালতী সচ্ছল মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। শুধু সেইজন্যে নয়, ভালো মেয়ে। সুন্দরী, শিক্ষিতা, সভ্য, মার্জিত-রুচি।

রাবারের চটি জোড়া পায়ে গলিয়েই বেরিয়ে পড়েছে মন্নু। দাড়িও কামায়নি। ও কলকাতার বাইরে বেরুলে পাঁচটি নিয়ম রিলিজিয়াসলি ফলো করে।

১। দাড়ি না—কামানো,

২। খবরের কাগজ না—পড়া,

৩। রেডিও না—শোনা,

৪। বাড়িতে কোনো ঠিকানা না—রেখে আসা,

৫। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো ফার্স না—করা।

অবশ্য চতুর্থ নিয়ম এমনিতেই মানতে হয়, কারণ ও নিজেই জানে না কোথায় থাকবে এবং কতদিন থাকবে। পঞ্চম নিয়মও, দায়ে পড়ে।

চেক-পোস্টের পাশের দোকানে বসে ওরা কুচো-নিমকি আর বালুসাই-এর মতো একরকম মিষ্টি দিয়ে চা খেল। ওখানেই শুনল যে, এখানে পাহাড়ের মধ্যে একজন তান্ত্রিক আছেন। চোর-ডাকাতের এলাকাতে, হাতীর দল আর হঠাৎ-আসা বাঘ-ভাল্লুককে থোড়াই কেয়ার করে উদোম ন্যাড়া পাহাড়ের খোলে একটি আশ্রম করেছেন। বাবার যে কী জাত তা কেউ জানে না। বাবার সঙ্গে একটি সুন্দরী বিদুষী, যুবতী মেয়েও থাকে। আশ্রমে রাতেরবেলা নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড হয় নাকি!

মনু বলল, চল্ যাই। আমার কেসটা তো প্রায় পেকেই এসেছে, এখন তোরও যদি একটা হিল্লে করা যায়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোর শুক্লাশশীকে তো আমি দেখেছি। তোর দোকানে এসে মাঝে মাঝে কার্নিক মেরে গেলে কী হবে? ও মেয়ে কোন্ চাঁদিয়াল ঘুড়ি কাটবে তা ঠিক-ঠাক করে রেখেছে। তুই যতই কবিতা লিখিস, আমার কাছে শোন. কবিতা-ফবিতা মেয়েরা একেবারেই বোঝে না। ওদের মতো ম্যাটার অফ-ফ্যাক্ট রসকষহীন জাত ভগবান এ দুনিয়াতে আর দুটি পয়দা করেননি। ওরা কি চায়, তা আমি জানি। গিভ ইট টু দেম গুড, দে উইল স্টিক টু উ্য লাইক বাবল্গাম। তোর দ্বারা কিসমু হবে না। নিজের দোকানের একসারসাইজ বুক, কিনতে তো আর পয়সা লাগে না। শুক্লাশশী একঝলক বুক দেখিয়ে যাচ্ছে কখনও সখনও; আর তুই শালা একসারসাইজ বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে লাগাতার কবিতা লিখে যাচ্ছিস। এ কবিতা, সে কবিতা নয় দোস্ত।

তুই বড় যা-তা কথা বলিস!

রাজীব চটে উঠে বলল:

সব ব্যাপারে এই মাত্রা—ছাড়া ইয়ার্কি ভালো লাগে না আমার। তোর রুচিটা আজকাল বিড়িওয়ালাদের মতো হয়ে গেছে।

খবরদার। ক্লাস তুলে কথা বলবি না। পার্সোনালি আমাকে যা বলার, যা খুশি বলার, বলতে পারিস। তোর নামে ডিস্‌ক্রিমিনেশানের অভিযোগ আনব।

তারপর নিজের মনেই বলল, তুই শালা ফেঁসে গেছিস দেখছি। শুক্লাশশীর স-সে-মি-রাতে। তোর মতো একটা আনপ্র্যাকটিকাল লোকের সঙ্গে আমাব বন্ধুত্বটা এত বছর যে টিঁকে রইল কি করে, সেটাই একটা মিরাকল্‌।

দোকানদারের নির্দেশমত পায়ে-চলা-পথে একটা পাহাড়ের মাথায় ওঠার পর ওরা একটা উপত্যকায় নামবে। এমন সময় মন্নু বলল, ক্যামেরাটা দে ত' রাজু, তোর একটা ছবি তুলি। চুলগুলো এলোমেলো, পাঞ্জাবী পায়জামা উড়ছে হাওয়ায়, উদাসী, বিরক্তী হিন্দি ফিল্মের দিলে—চোট-খাওয়া হীরোর মতো দেখাচ্ছে তোকে। দেখি, তোর এই ছবি দিয়েই কাৎ করতে পারি কিনা শুক্লাশশীকে। লাস্ট এফার্ট!

রাজীব প্রতিবাদ করার আগেই মন্নু ক্যামেরাটা ওর কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছবি তুলল রাজীবের।

ঠিক এমনি সময় লাল আর কালো ডুরে একটা তাঁতের শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে অতি সুন্দরী একটি মেয়ে ওদের পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? এখানে কী করছেন?

ওরা দুজনেই চমকে উঠে একই সঙ্গে মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটি যেন মাটি ফুঁড়েই উঠল মনে হল।

এতক্ষণ ওকে দেখতে পায়নি যে কেন, তা ভেবে অবাক হলো দুজনেই। মেয়েটির হাতে একটি মাটির কলসি। চান করেছে সবে। এখনও চুল—ভেজা। একরকম তেজী পবিত্রতা চোখে মুখে। রাজীব স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো মেয়েটির দিকে।

মন্নু কথা বলল, ঘোর কাটিয়ে উঠে।

আপনারা?

কোথা থেকে এসেছেন?

কলকাতা থেকে।

কোথায় যাচ্ছিলেন? এদিকে?

তান্ত্রিক বাবাজীর আস্তানার দিকে।

কে বলল? বাবাজীর আস্তানার কথা আপনাদের?

চেক-পোস্টের দোকানি। আপনার কথাও সেই-ই বলল। আপনি নিশ্চয়ই তিনি। তবে, আপনারা যে বাঙালী একথা তো কেউই বলল না।

আমি বাঙালী। বাবাজীর জাত নেই কোনো। বাবাজী তান্ত্রিক।

তারপর বলল, চলুন, আমি আশ্রমের দিকেই যাচ্ছি।

যেতে যেতে কথা হলো টুকটাক।

মেয়েটি এমনি বেশ ছটফটে। কিন্তু বেশ রাসভারীও।

এই দিকের উপত্যকাতে অনেক গাছপালা এখনও আছে। পীচ রাস্তা থেকে যদিও বোঝা যায় না। শালবনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মেয়েটি বলল, আপনারা দুজনেই তো ছেলেমানুষ। তন্ত্রসাধনার আপনারা কী বোঝেন? যাচ্ছেন কেন বাবাজীর কাছে?

মন্নু বলল, সত্যি বলছি, কিছুই বুঝি না। বুঝতে চাইও না। আমরা আসলে আপনাকে দেখতেই এসেছিলাম। তাছাড়া ছেলেমানুষ হলেও, বয়স আপনার চেয়ে বেশিই হবে আমাদের।

মেয়েটি বলল, বয়স কি আর বয়সে হয়?

তারপরই বলল, দেখতে এসেছিলেন আমাকে?

বলেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, দেখা তো হলো। তাহলে আর এগোনো কেন? ফিরে যান এখন।

মেয়েটির কথার পিঠে মন্নু বলল, এটুকু দেখাতে কি মন ভরে? আপনি সত্যিই খুউব সুন্দরী! শিউলি ফুল, কেমন ভুল।

মেয়েটি হাসল।

বলল, সুন্দরী মেয়ে ত আপনাদের কলকাতায় অনেকেই আছে। আপনারা আমার শুধু সুন্দর দিকটাই দেখছেন। অন্য দিকটা দেখেননি। আমি ভৈরবী। ভয়ংকরী।

সেকি! আপনি ভৈরবী? বাবাজী তাহলে আপনার বাবা নন? মন্নু অবাক গলায় বলল।

বাবাজী বললেই কি বাবা হতে হবে নাকি? আশ্চর্য তো!

মন্নুকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই সে আবার বলল, তন্ত্রসাধনা অনেক গভীর ব্যাপার। আপনাদের মতো অগভীর, অনভিজ্ঞ দুধের দাঁতের ছেলেদের সঙ্গে এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। আপনারা দয়া করে ফিরে যান। বাবাজী জানতে পারলে বিপদ হতে পারে আপনাদের। উনি দূরে বসেই সব জানতে পারেন। আমিও পারি একটু-আধটু।

মন্নু জিনস-এর হিপ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে ঠাট্টার গলায় বলল, তাহলে ফিরেই যাব বলছেন?

হ্যাঁ। তাই-ই বলছি।

দৃঢ় গলায় মেয়েটি বলল।

রাজীব অবাক হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ করছিল! এমন মেয়ে রাজু খুব বেশি দেখেনি। কলকাতার মতো জায়গায় এমন মেয়েরা বোধ হয় থাকে না, থাকলেও অন্যরকম হয়ে যায় দুদিনে। চারিদিকের জঙ্গল, পাহাড়, উন্মুক্ত প্রকৃতি, পাখি, প্রজাপতি, ফুল সব যেন কেমন এক মুক্তির প্রতিফলন ফেলেছে মেয়েটির মুখে।

মন্নু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক হ্যায়। এখন ফিরেই যাচ্ছি। কিন্তু আমরা আবার আসব। রাত্তিরে। কোন্ সাধনা করেন আপনি তা দেখতে নিরিবিলিতে।

মেয়েটির চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

বলল, সাবধান করছি আপনাদের।

মন্নু বলল, চোখ রাঙাবেন না ম্যাডাম। আমরা কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র নই। আমরা রাতে এসে আপনার কেসটা আসলে যে কী, তা ইনভেস্টিগেট করব।

মেয়েটি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল মন্নুর দিকে।

তারপর বলল, তাহলে আসবেন। নেমন্তন্ন রইল আপনাদের।

নেমন্তন্ন নিলাম। বলল মনু।

মেয়েটি চলে গেল।

ওরা ফিরে আসতে লাগল পাহাড় বেয়ে।

রাজীব অনেকক্ষণ পর বলল, তোর মাঝে মাঝে কী হয় বল তো? এ রকম ছোটলোক হয়ে যাস কেন? কী চাস তুই? কী পাস এবকম অভদ্রতা করে। অচেনা অজানাদের সঙ্গে?

মনু দাঁড়িয়ে পড়ে, রাজীবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি নিজেই ঠিক জানি না। মালিকের খাতায় কারচুপি করতে করতে—তার ব্যবসা চালানোর গা-গোলানো ফিরিস্তি শুনতে শুনতে সারা শরীর রি-রি করে। যাদের উপর রাগ, তারা যে অনেক উপরের তলার মানুষ রে রাজু! অনেক দূরেরও মানুষ! তারা যে আমার নাগালের একেবারেই বাইরে। তাই, যাদের হাতের কাছে পাই, যেমন আমার মা, তুই! এই সুন্দরী ভৈরবী মেয়েটা; তাদের কাছেই বিনা-কারণে অন্যায়ভাবে ফেটে পড়ি। কারণ, জানি যে, তারা আমার ক্ষতি করবে না। বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই।

রাজীব বলল, তুই এই চাকরিটা ছেড়ে দে।

ইডিয়ট।

বলল, মনু। আমার মালিক বেচারা আমার চেয়ে অনেক ভালো মানুষ। তার অবস্থা দেখেও কান্না পায়। বেচারি পারেখ সাহেব। ইটস অ্যা বিগ ভিসাস্ সার্কল নাউ। এন ইম্মরাল সার্কল। আইদার উ্য ফিট ইন ইওর-সেলফ অ্যাজ অ্যা কম্পোনেন্ট অর উ্য ফল আউট। দেয়ারস নো চয়েস্। কারোই আর কোনো চয়েস অবশিষ্ট নেই। আমারও নেই। এই বাজারে পনেরশো টাকা মাইনে পাই, হাউস-রেণ্ট পাই, দুটো বোনাস, ফ্রি-টিফিন। তারপর খাতায় যা কিছু অ্যাডজাস্টমেণ্ট তা সব আমিই করি বলে, ক্যাশও পাই বছরে হাজার পাঁচেক টাকা করে। কিন্তু শুনতেই সব। কি হয়? টাকার দাম কোথায় নেমে গেছে বল্। চাকরি ছেড়ে দিলে খাব কী? বউ-এর পয়সায় বসে খাব?

রাজীব বলল, তোর মালিকের এত গুণগান করছিস—তা তোর মালিক ট্যাক্স ফাঁকি দেয় কেন ?

মন্নু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, চুপ কর শালা। যদিও মাসে আমার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করিস তুই, কিন্তু তুই কি ট্যাক্স দিস ? তুই তো এক পয়সাও ঠেকাস না। দেওয়া উচিত ; কিন্তু দিস না। কিন্তু আমি দিই। তোরা অনেকেই এক পয়সাও দিস না বলেই যারা দেয় তাদের ঘাড়ে গিলোটিন পড়ে। তোরাও কম ক্রিমিনাল নোস।

আমার মালিক বছরে চুরি-টুরি করেও, গড়ে পাঁচ-সাত লাখ ট্যাক্স দেয়—তার বদলে তোর দিল্লীওয়ালারা কী দেয় তাকে ? আমরাই বা কী দিই ? অসম্মান আর চোর অপবাদ ছাড়া ? আমার মালিকের অবস্থাও আমারই মতো। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো যাকে কাছে পায়, তাকেই কামড়াতে যায় ! এত টাকা গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে গরিবদের জন্যে কি করল শালারা এত বছর, বলতো ? গরিব তো আরও গরিব হয়েছে। যারা ট্যাক্স দেয় তারাও ট্যাক্স নিয়মিত দিলে হাতে হ্যারিকেন ছাড়া আর কিছু যে থাকে না কারও হাতেই। আমরা সব নপুংসক হয়ে গেছি, বুঝলি রাজু। রিয়্যাল নপুংসক। ভোট পাওয়ার জন্যে আর গদীতে থাকার জন্যে মানুষগুলো কী ফেরেববাজীই না করে ! পুরো জাতটার আত্মসম্মান, শুভাশুভবোধ, ডিসিপ্লিন, নৈতিক চরিত্র সবই কমপ্লিটলী নষ্ট করে দিল এই নেতাগুলো।

রাজীব চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোর কোনো ট্র্যাঙ্কুলাইজার খাওয়া উচিত। মানে, সেডেটিভস্। তুই দেখছি, একেবারেই মেণ্টাল কেস হয়ে যাচ্ছিস।

—আমি ? হ্যাঁ হচ্ছি। অন্যরা যে কেন এখনও হচ্ছে না, তা ভেবেও অবাক লাগে আমার। সব জেনেও, কেন যে হচ্ছে না ? সর্বনাশের আসন পেতে পুরো জাতটা বসে বসে নিজের নিজের স্বার্থপরতার ভাত খুঁটে খাচ্ছে। এমন ভাতে পেচ্ছাপ করে দিতে ইচ্ছে করে আমার। ত্তুস শালা ! যত্ত সব···।

একটা অশ্লীল-গাল দিল মন্নু।

॥ ৩ ॥

ওরা যখন বাংলোর গেটে পৌঁছল, তখন দেখল তিন-চারজন পুলিশ অফিসার বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। দুপুর বারোটা হবে তখন। আর কিছু রাইফেল-ধারী পুলিশ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুলিশের জীপ আর ভ্যানও দেখল।

রাজীব চাপা গলায় বলল, দেখলি তো। ভৈরবীর অভিশাপ! এখন কী হবে কে জানে? কে জানে ভৈরব অথবা ভৈরবীই হয়ত টেলিপ্যাথী করে পুলিশকে খবর দিয়েছে!

মন্নু বলল, বাজে কথা এখন রাখ।

গলা নামিয়ে বলল, সকালে বাথরুমের পেছনের পুকুরে একটা উনিশ কুড়ি বছরের আদিবাসী মেয়ে ন্যাংটো হয়ে চান করছিল তার ছবি তুলছিলাম যখন, তোর ক্যামেরা দিয়ে, তখন চৌকিদারটা দেখেছিল। ঐ বোধহয় গিয়ে খবর দিয়েছে। অ্যারেস্ট করতে এসেছে আমাদের।

তারপর নিজেই বলল, কী অবস্থা ছাখ। কত লোক খুন হয়ে যাচ্ছে, কত মেয়ে রেপড্ হয়ে হাপিস্ হয়ে যাচ্ছে সে-সবের কোনোই কিনারা হচ্ছে না, আর দূর থেকে একটা মেয়ের ফোটো তোলার জন্যে ফোর্সের বহর ছাখ্।

রাজীব বলল, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এই রকম ছোট্ট জায়গায় এত পুলিশ! তোকে ধরতে নিশ্চয়ই আসেনি। অন্য কোনো ব্যাপার ট্যাপার হবে। ডাকাতি টাকাতি হয়েছে হয়তো। নয়তো নকশাল ছেলেরা কিছু করেছে বোধ হয়। জায়গাটা তো লুকিয়ে থাকার পক্ষে আইডিয়াল।

মন্নু সংক্ষিপ্ত চাপা গলায় বলল, আর কথা নয়।

ওরা পায় পায় এগিয়ে গিয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছল।

একজন অফিসার বললেন, রিজার্ভেশান আছে আপনাদের?

না। নেই।

মন্নু বলল, সপ্রতিভ ওড়িয়াতে।

মন্নু রিজার্ভেশন নেই একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অফিসারদের বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কেন এসেছেন ?

দারোগা ভদ্রলোক বললেন, আসলে আমার উপরওয়ালা এসেছেন একটা মার্ডার কেসের ইনভেসটিগেশানে—কিন্তু এখানে ওঁদের বসিয়ে যে খাওয়াই এমন ভদ্রগোছের একটা জায়গা পর্যন্ত নেই! তাই আমরা এসেছিলাম এই বাংলোতে লাঞ্চ করতে। যখন…

মন্নু বলল, আসুন, বসুন। আমাদের সঙ্গে কোনো মহিলা-টহিলা নেই—অসুবিধা কিসের ? নিশ্চয়ই খাবেন।

বলে, সকলকেই আদর করে ভিতরে বসাল।

বাঙালী বাবুর মুখে এমন চমৎকার ওড়িয়া শুনে এবং মন্নুর ভদ্র ব্যবহারে ভদ্রলোকেরা খুবই খুশী হলেন। ওঁরা যথার্থই ভদ্রলোক। পুলিশ অথচ এমন ভদ্রলোক বড় একটা দেখা যায় না। হয়তো পুলিশের কাজটাই এমন যে, কিছুদিন চাকরি করার পর ভদ্রতাটা একটা ফালতু অপব্যয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ওঁরা দুজন, মানে, দারোগা আর সার্কল-ইন্সপেক্টর খেতে বসলেন ভিতরে। ছোট দারোগা বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিলেন। তিনি খাওয়া দাওয়ার তদারকি করতে লাগলেন। কনস্টেবলরা খাবার বয়ে নিয়ে এল।

এমন সময় সার্কল ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা খেয়েছেন ?

রাজু ইংরিজীতে বলল, না, না, আপনাদের জন্য ভাববেন না। আমাদের খাবার এসে যাবে।

কোত্থেকে ? এখানে কী হোটেল আছে ?

দারোগা নিজের থালার ভাত থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আছে তো! মন্নু বলল।

আমরা অলরেডি খাবার অর্ডার করে দিয়েছি।

ছোট দারোগা হেসে ফেললেন।

বললেন, শুনি, কী খাবার?

মন্নু বলল, মুগের ডাল, কন্দমূল ভাজা আর··।

তারপর একটু থেমে বলল, ভাত।

সার্কল ইন্সপেক্টরও পাত থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন।

বললেন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে না খেলে আমরা খাই কী করে? আপনারা আমাদের অতিথি।

ভীষণ লজ্জায় পড়ল ওরা দু বন্ধু। কিন্তু ওঁরা কোনো কথাই শুনলেন না। ওদের জন্যেও খাবার এল। ফাইন চালের ভাত চমৎকার মুগের ডাল, অমৃতভাণ্ড, মানে পেঁপের তরকারি, আলু ভাজা, পাহাড়ী নদীর ছোট মাছের স্বাদু ঝোল। এবং পায়েস।

লজ্জিত মুখে খেতে খেতে রাজু ভাবছিল, ভগবান কার কপালে যে কোথায় কী রকমের খাওয়া রেঁধে রাখেন তা ভগবানই জানেন।

রাজু এই ওড়িয়া পুলিশ অফিসারদের ভদ্রতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছিল। মন্নু ওকে বহুদিন ওড়িয়া সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, গান, ওড়িশী নাচ, ওড়িশী ফিলিগ্রি ও তাঁতের কাজ-এর গল্প করে এসেছে এবং চিরদিন জোরের সঙ্গে বলেছে যে, ওড়িশার একজন গড়পড়তা ওডিয়া একজন গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে অনেক ভদ্র। আজকে নিজের চোখে পুলিশের কাছে এই ব্যবহার পেয়ে কথাটার সত্যতা বুঝতে পারল রাজু। মন খুশিতে, কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। স্বার্থ অথবা ভয় ছাড়া, আজকাল কেউ কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এ কথা যে ভাবাই যায় না।

খেতে খেতে রাজু বলল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাবেন? আমরা কখনও মার্ডার দেখিনি।

ওঁরা সকলেই রাজুর কথায় ভাত-মুখে হেসে উঠলেন।

বললেন, আপনি ভাগ্যবান। মার্ডার না-দেখাই ভালো। আর দেখলেও যা ঝামেলা। সাক্ষী হওয়ার শাস্তি, যে মার্ডার করেছে, তার

শাস্তির চেয়েও বোধ হয় বেশি।

বড় দারোগা, সার্কল ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চাইছেন।

সার্কল ইন্সপেক্টর রাজুকে বললেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা আছে—আমাদের কাজে লাগতে পারে, মার্ডারের স্পটটার ছবি তুলতে এভিডেন্স যদি কিছু থাকে, তারও ছবি তুলতে।

মনু বলল, চমৎকার। তবে আমার বন্ধু ছবি তুললে একটাও উঠবে না, এইই যা। আমাকেই ছবি তুলতে হবে।

দারোগা বললেন, যেই-ই তুলুন। ছবি উঠলেই হলো।

মনু শুধোল, পলিটিকাল মার্ডার? মার্ডারের হদিস পেলেন? মার্ডার হয়েছে কে?

এমন সময় বাইরে কনস্টেবলরা একসঙ্গে কি যেন বলাবলি করে উঠল এবং ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ করতে করতে একটা গরুর গাড়ি এসে বাংলোর কম্পাউণ্ডে ঢুকল।

সার্কল ইন্সপেক্টর আর বড় দারোগার চোখে চোখে কথা হলো।

দারোগা বললেন. ঐ দেখুন, লাশ এসে গেছে।

রাজুর পেটের মধ্যেটা গুলিয়ে উঠল। ও আর খেতে পারল না। গরুর গাড়ির গা-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল নিচে ফোঁটা ফোঁটা। মাদুর আর দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি লাশ।

দারোগা বললেন, চলুন দেখবেন।

এমনভাবে বললেন, যেন কোনো সুন্দর কিছু দেখতে অনুরোধ করছেন। কোনো হরিণশিশু। অথবা হলুদবসন্ত পাখি।

রাজুর পা দুটিকে কে যেন অ্যারালডাইট দিয়ে বাংলোর ঘরের মেঝেতে সেঁটে দিল। মনু কিন্তু বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে. ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে।

দারোগা মৃতের মুখের উপরে যে কাপড় চাপা ছিল তা কনস্টেবলদের খুলে দিতে বললেন।

মনু ছবি তুলল। ঘরে বসেই, জানালা দিলে দেখল রাজু।

ভাবল, মন্টুটা পারেও। ওর মধ্যে বীভৎসতা, নৃশংসতার অনেক সুপ্ত বীজ লুকোনো আছে। কোনদিন ও নিজেও কাউকে খুন করলে রাজু অন্তত অবাক হবে না।

সার্কল ইন্সপেক্টর বাথরুমে হাত ধুতে গেলেন।

ফিরে এলে, রাজু জিজ্ঞেস করল, কখন হয়েছে?

সকালবেলা। সাতটার সময়।

কেন?

ধান নিয়ে। এই যে ভাত খেলেন লাল চালের, এর স্বাদ বড় মিষ্টি। ধান কাটছিল ছেলেটা। ওরই খুড়তুতো জ্যেঠতুতো ভাইয়েরা অনেকে মিলে একসঙ্গে মেরেছে। ওর ভাই আর বাবাকেও হয়তো মারত—তারা বেঁচে গেছে।

খুনীদের ধরা যাবে?

ধরতে হয়নি। যে আসল খুনী, খাঁড়া দিয়ে যে বারবার কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে, সে নিজেই খুন করে রক্তমাখা খাঁড়া হাতে এসে থানায় খুনের খবর দিয়েছে, এবং কবুল করেছে যে, সে-ই খুনী। এই আদি-বাসীরা অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। ওরা মরতে ভয় পায় না মারতেও না। মিথ্যেও কম বলে। অনেকে তো একেবারেই বলে না।

সত্যি?

অবাক হয়ে রাজু বলল।

হ্যাঁ!

লোকটা কি খুব বড়লোক? জোতদার-টোতদার?

ফুঃ। দু এক গুঁঠ জমি ছিল কিনা তাই-ই সন্দেহ। যারা মেরেছে, এবং যাকে মেরেছে সকলেরই সমান অবস্থা। যে জমিতে ধান কাটা হচ্ছিল সেই জমি ওদের পূর্বপুরুষের জমি। ঐ জমিটুকুর মালিকানা নিয়েই গোলমাল।

আপন জ্যেঠতুতো ভাই হয়ে···ধানের জন্যে···

রাজু বলল।

বাইরে, মন্টু বিভিন্ন দিক থেকে মৃতের ছবি তুলছিল।

সার্কল ইন্সপেক্টর রাজুর কথা শুনে হাসলেন। বললেন, ধান বড় দামী। সকালে বেরিয়েছিলেন আপনারা, চারধারে ধানক্ষেত দেখেননি? এখানে চারদিকেই তো পাহাড় আর ধানক্ষেত। পাকা ধানের রঙ নজর করে দেখবেন—কেমন লাল—একেবারে রক্তের মতো লাল। শুধু ওড়িশা কেন আমাদের সব রাজ্যের ধানেই রক্ত মাখানো থাকে। বলেই, ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

রাজু অবাক হয়ে তাকাল সার্কল ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে।

ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় অধ্যাপক। কোনোরকম নেশা নেই। সিগারেট নয়, পান না; অন্য বড় নেশা তো নয়ই। এমন কি চাও নাকি খান না।

কেন খান না, জিজ্ঞেস করাতে বললেন, পুলিশের চাকরি বড় প্রলোভনের চাকরি। এই চাকরিতে বহাল থেকে এদেশে যা কিছু চাইলেই সহজে পাওয়া যায়। তাই আমার বাবা এই চাকরিতে ঢোকার আগে তাঁর গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, কোনো নেশা করতে পারব না। পান থেকে সিগারেট, সিগারেট থেকে তাস তাস থেকে মদ, মদ থেকে মেয়েমানুষ—নেশা একটা থেকে অন্যটাতে গড়িয়ে যায়—আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও গড়াতে থাকে নিজের অজান্তে।

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, বাবার কথা মেনেই চলি। এ চাকরি সত্যিই বড় প্রলোভনের। নিজের পা একবার টলে গেলে অন্যদের শাসন করব কী করে?

শ্রদ্ধাভরা চোখে রাজু, নন্দনকুমার নন্দ, হাতিঝোড়ার সার্কল ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ-এর দিকে চেয়ে রইল।

মনে মনে বলল, মন্টুটা মিছিমিছিই রাগারাগি করে মরে। যে দেশে এমন পুলিশ অফিসার আছে, সে দেশের ভবিষ্যৎ এখনও নিশ্চয়ই আছে। এত হতাশ হবার মতো এখনও কিছুই হয়নি!

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রাজু।

গরুর গাড়ি আবার ক্যাঁচোর কোঁচোর করতে করতে বাংলোর হাতা

ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এবং খালি গায়ে ধুতি মালকোঁচা-মেরে পরা একটি দুবলা কালো-কোলো ছেলে। তার চোখে জল নেই, কিন্তু দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

মন্নু আর বড় দারোগা ফিরে এল ঘরে।

মন্নু নিজেই যেন পুলিশ অফিসার এমনভাবে রাজুকে বলল, লাশ চলে গেল লাশ-কাটা ঘরে, হাতিঝোড়ায়।

হাতিঝোড়া কতদূর? এখান থেকে?

পাঁচকিলোমিটার। বললেন বড় দারোগা, চাঁদবাবু।

রাজু শুধোল, সঙ্গে সঙ্গে গেল, ছেলেটি কে?

বড় দারোগা বললেন, ও ভিক্টিমের ছোট ভাই।

সার্কল ইন্সপেক্টর বললেন, এবার যাওয়া যাক।

বড় দারোগা আর সার্কল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রাজু আর মন্নুও উঠল জীপে।

রাজু ছোট গল্প ও কবিতা লেখে এ কথা মন্নু ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছিল ওঁদের। নিয়মিত নানা লিটল ম্যাগাজিনে এবং বড় কাগজেও দু একবার, রাজুর লেখা যে ছাপা হয় এবং হয়েছে এ কথাও জানাতে ভোলেনি।

তাতে রাজুর ইজ্জত জীপে ওঠার পর থেকে আরও বেড়ে গেল। একজন গড়পড়তা ওড়িয়াও কতখানি সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং সাহিত্যপ্রেমিক তা এঁদের এই ব্যবহারে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারল রাজু।

ছেলেটার নাম কী? মানে লাশটার?

লাশের নাম হয় না। চাঁদবাবু হেসে বললেন। লাশের নাম লাশ। লাশের ঠিকানাও হয় না, কী স্যর, হয়?

নন্দবাবু বললেন, নাম হয় না, তবে ঠিকানা হয়: লাশ-কাটা ঘর।

চাঁদবাবু বললেন, যখন বেঁচে ছিল ছেলেটা তখন ওর নাম ছিল সুরাই।

সুরাই?

মন্নু স্বগতোক্তি করল।

আদিবাসী?

হ্যাঁ। কোল্‌হো।

আর যে মেরেছে? তার নাম?

কে মেরেছে তা তো আদালত বলবেন। এবং আদৌ মেরেছে কি না তাও। আমরা শুধু আপাতদৃষ্টির কারবারী। চাঁদবাবুর হেপাজতে যারা নিজেরাই ধরা দিয়েছে এবং যাদের ধরা হয়েছে তারা সকলে মিলে অনেকজন।

কজন সবশুদ্ধ চাঁদবাবু?

সাত জন স্যার।

তাদের নাম কী?

সুরা, সিথা, সামা, ওরফে নান্ধু, লক্ষ্মণ, ওরফে হোডিং, বানিয়া ওরফে পাগা, তুরী, ওরফে কান্‌কা, আর মকর।

ওরা সকলেই জাতে কোল্‌হো?

সকলেই। একই পরিবারের লোক তো সব।

নন্দবাবু বললেন।

তারপর বললেন, ওদের সকলেরই ঠাকুর্দার বাবা এক।

ঠাকুর্দার বাবার নাম কী ছিল, চাঁদবাবু?

ঠাকুর্দার বাবার নাম সুরা নায়েক। সুরা নায়েকের অনেক ছেলে-মেয়েই ছিল, কিন্তু যে জমির টুকরোটুকুর ধানকাটা নিয়ে সুরাই খুন হলো, সেই জমি পড়েছিল সুরা নায়েকের দুই ছেলে মোহান্তি আর সালাই-এর বংশধরদের ভাগে। জমি টুকরো টুকরো হতে হতে এখন এদের এক-একজনের হাতে দু-এক গুঁঠ করে আছে। এই জমিতে কতটুকুই বা ধান হয়?

এইটুকু জমির জন্যে খুন করল? রাজু বলল। ইসস্‌··

মন্নু রাজুকে ধমকে বলল, তুই চুপ কর ত। থাকিস সাউথ ক্যাল-কাটায়, বাবার বাড়ি আছে, বাড়ি-গাড়িওয়ালা লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিস, তুই কি বুঝবিরে এসবের? জয়নগরের জমিদার!

রাজু চটে গেল। বলল, তুইও হঠাৎ কবে থেকে এমন জনদরদী

নেতা হয়ে গেলি গুজরাটি ব্যবসাদারের ট্যাক্স-ফাঁকি দিইয়ে আর বুর্জোয়ার মেয়ের সঙ্গে এনগেজড হয়ে ?

চাঁদবাবু মোটাসোটা মানুষ। ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে ! ভারি ছেলেমানুষ তো আপনারা !

মনু বলল, মানুষের জন্যে মানুষের দরদ থাকে বুকের মধ্যে। গরিবের জন্যে যেটুকু দরদ আমার বুকে আছে তা ছেলেবেলায় গরিবী দেখেছি বলে : গরিব কাকে বলে, তা জানি বলে। মানুষ নিজে স্বচ্ছল অথবা কোটিপতি হলেই বুঝি তার গরিবের প্রতি দরদী হতে বাধা থাকে ? তাহলে তো চিত্তরঞ্জন দাশের দেশ-সেবা করার এক্তিয়ার ছিলো না। লেখাপড়া শিখে এমন বোকা বোকা কথা বলিস না তুই, সত্যিই রাগ ধরে যায়।

তুইও কি কম্যুনিস্ট ? কিছুই বলার নেই তাহলে। তুইও যদি···

রাজু বলল।

তুই একটা স্টুপিড্।

রেগে গিয়ে মনু বলল।

চাঁদবাবু আর নন্দবাবু দুজনেই বাংলা পুরোপুরি বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।

চাঁদবাবু বললেন, যে হেল্লা সে হেল্লা এব্বে আপনমান···

নন্দবাবু বললেন, ইয়েস, ইয়েস। এনাফ্ ইজ এনাফ্।

মনু আর রাজীব দুজনেই রাগে এবং এঁদের সামনে রাগারাগি করার লজ্জায় চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

জীপটা চলছিল পীচের রাস্তা ধরে। বাঁদিকে একটা পাহাড়ের রেঞ্জ। নাম গুডুংগিরিঘাটি। পানিপাঁই রেঞ্জ ছেড়ে এসেছে ওরা। আর এদিকে বিড়ু থানা।

এবার জীপ পাকা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে কাঁচা লালমাটির রাস্তাতে ঢুকল। পিলগাঁও বলে একটা সুন্দর সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসে বিড়ু গ্রামে পড়ল।

রাজু বলল, এ কি ! বিড়ু গ্রামটা এখানে আর বিড়ুর ডাকবাংলো

আর থানা অত দূরে ?

হ্যাঁ। চাঁদবাবু বললেন। আগে হয়ত এই অঞ্চলে শুধু বিড়ু গ্রামটিই ছিল। তাই পুরো জায়গারই ঐ নাম হয়েছে।

বিড়ু গ্রাম পেরিয়ে এসে ওরা আবার ফাঁকা জায়গাতে পড়ল। দুধারে ঢেউখেলানো ধানক্ষেত। পাকা লাল ধান ফলে আছে সারা ক্ষেতে। সুরাই নামের একটা ছেলে ধানের ক্ষেতে তার রক্ত ঢেলে সেই রক্তকে আরও গাঢ় করে দিয়ে গেছে আজ সকালে। শুধু যে জুড়ুয়া গ্রামে ওরা আছে, সেখানেই নয়; সারা ভারতবর্ষে, আসলে ভারতবর্ষের সব রাজ্যের গ্রামে ক্ষেতে ক্ষেতে এই সুরাই-এর মতো অনেক অনেক অজানা লোক তাদের মুখের রক্তে, বুকের রক্তে, তাদের ভালোবাসায়, ক্রোধে, আশায়, হতাশায়, দীর্ঘশ্বাসে ধানের রঙ লাল করে দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে গেছে যুগের পর যুগ। তার খবর কখনও রাখেনি রাজুরা। মার্কারী আর হ্যালোজেন ভেপারের আলোজ্বলা ঝলমলে শহরে, খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিলে বসে ফেলে ছড়ে ওরা ভাত খায়। খিদে না থাকলেও খায়। ক্ষিদে বাড়াবার জন্যে ডাক্তার দেখায়। সকালের খবরের কাগজে ছোট একটি খবর "ধান-কাটার হাঙ্গামাতে একজন খুন" ওদের কখনও বিচলিত করে না। পরক্ষণেই ভুলে যায়। ওদের কাছে কিছুমাত্র তাৎপর্য নেই সে খবরের।

রাজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুকের ভিতরটা কেমন মুচড়ে উঠল। একটা অব্যক্ত চাপা ব্যথা—কিসের জন্যে, ঠিক কাদের জন্যে ও জানে না, কিন্তু ব্যথাটা যে সত্যি তা সে অনুভব করে এবং সেই হঠাৎ ব্যথাটা তার মধ্যে ঘুমিয়ে-থাকা সুখী মানুষটাকে একটা ভীষণ ধাক্কা দিয়ে যায়।

মনু একটা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা চাঁদবাবুকে দিয়ে ডানদিকের ধানক্ষেতে তাকিয়েছিল। ওর চোখের দৃষ্টি উদাস। রাজু একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। রাজুর মনে হলো, সবসময় ক্রুদ্ধ, বিরক্ত মনুকে অনেকদিন ও এমন শান্ত এবং সমাহিত দেখেনি।

ধুৎ। এবারের বেরোনোটাই মাঠে মারা গেল। খুন-খারাপি, রক্ত-

টক্ক, দুঃখ-অভাব—এসব রাজুর একেবারেই বরদাস্ত হয় না। নিজের জীবনেই কত রকমের প্রবলেম আছে। নিজের যন্ত্রণায় নিজে জড়িয়ে থেকে ও এসব অজানা, অচেনা, গ্রাম-পাহাড়ের লোকের ফালতু ঝুট-ঝামেলায় না-ফাঁসলেই ভাল করত। ও একটু লেখে-টেখে বলে, ওর মনটা খুবই নরম। কারো দুঃখই ওর দেখতে ভালো লাগে না। নিজের দুঃখও নয়। তাই বছরের এই সাতটি দিন একটু দুঃখ ভুলতে এসে ....

মনু সার্কল-ইন্সপেক্টর নন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করল—এক গুঁঠে কত জমি? মানে, কত গুঁঠে এক একর জমি হয়?

জবাবটা দিলেন দারোগা চাঁদবাবু। বললেন, জমির হিসেব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। তবে এখানে হিসেব মোটামুটি এইরকম। মানে একর থেকে যদি শুরু করেন।

তা-ই যদি করি?

রাজু বলল।

তাহলে ষোলো বিশ্বে এক গুঁঠ।

বিশ্ব? রাজু অবাক হয়ে চাঁদবাবুকে থামিয়ে দিল।

হ্যাঁ, বিশ্ব। আমাদের ওড়িয়্যাতে বিশ্ব হচ্ছে জমির সবচেয়ে ছোট মাপ। আপনাদের কি? ওয়েস্টবেঙ্গলে?

ছটাক্।

মনু বলল, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে।

রাজু বলল, কী আশ্চর্য। বিশ্ব। কত ছোট বিশ্ব। কী ভীষণ ছোট।

মনু বলল, আরম্ভ হলো কবির কবিত্ব। এই একমুঠো বিশ্বর জন্যেই সুরাই বলে ছেলেটা আজ সকালে খুন হয়ে গেল—। স্টপ দিস রাজু। প্লিজ স্টপ দিস। আই অ্যাম রিয়্যালী গেটিং ওয়ার্কডআপ।

তারপর চাঁদবাবুর দিকে ফিরে বলল, বলুন চাঁদবাবু, কি বল-ছিলেন?

হ্যাঁ। যা বলছিলাম; একশ ডেসিমেলে এক একর। উনসত্তর ডেসিমেলে এক মান।

মান?

রাজু বলল।

মানে, এক মান জমি না থাকলে মানী হওয়া যায় না—অল্প-স্বল্প মানীও হওয়া যায় না, না?

স্টপ ইওর বাবলিং, ইউ স্পয়েল্ড চাইল্ড।

মন্টু আবার ধমকে বলল রাজুকে।

বলেই বলল, বলুন, বলুন তো চাঁদবাবু যা বলছিলেন।

এবার নন্দবাবু বললেন, উনসত্তর ডেসিমেলে এক মান। তিন ডেসিমেলে এক গুঁঠা। আর এক গুঁঠে ষোলো বিশ্ব। ··

রাজু বলল, বিশ্ব। বিশ্ব।

মন্টু কি বলতে যাচ্ছিল রাজুকে, এমন সময় চাঁদবাবু বললেন, ঐ যে দূরে বাঁদিকে গ্রামটা দেখছেন, ঐ গ্রামেই আমরা যাব।

মন্টু স্বগতোক্তি করল, জুড়ুয়া।

হ্যাঁ।

ঐ হচ্ছে জুড়ুয়া। আরও একটু এগিয়ে গেলে ছোট জুড়ুয়া।

রাজু বলল, আচ্ছা, ঐ যে ছেলেটা, সরি, লাশটা; ওর বিয়ে হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে আছে?

নন্দবাবু আর চাঁদবাবু দুজনেই চুপ করে রইলেন।

একটু পরে চাঁদবাবু বললেন, ছেলে-মেয়ে নেই কিছু। তবে বিয়ে হয়েছিল। চারদিন আগে।

কী বললেন?

মন্টু কামারের হাতুড়ি-পড়া জ্বলন্ত লোহার ফুলকির মতো ছিটকে উঠে বসল।

নন্দবাবু কনফার্ম করলেন। বললেন, ইয়েস। দ্যাটস আ ফ্যাক্ট।

জীপটা জুড়ুয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকে আবার ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল। ছোট গ্রাম একটি।

রাজু বলল, এই গ্রামে কি শুধু কোল্‌হোরাই থাকে?

না, না। কোল্‌হো আছে, মুর্মু আছে, আদিবাসী নয় এমনও অনেক আছে। ওড়িয়া।

মন্নু বলল, এ গ্রামের সবচেয়ে বড়লোক কে ?

তিনি সবদিক দিয়ে বড়। এই অঞ্চলের নামী লোক তিনি।

কে ?

রাজু শুধোল।

উনি একসময় এম-পি ছিলেন।

বলেন কি ? এই রকম গ্রামে এম-পি !

রাজু অবাক গলায় বলল।

চাঁদবাবু বললেন, এই আপনাদের বড় শহরের লোকদের দোষ ! এম-পি, এম-এল-এ কি সব শহর থেকেই হবে ? আসল দেশটা তো শহরের বাইরেই। অথচ আপনারা শহরের লোকেরা. সেই দেশটারই কোনো খবর রাখেন না।

মন্নু বলল, উনি কোথায় থাকেন ? দিল্লীতে ? না ভুবনেশ্বরে ?

চাঁদবাবু বললেন না, না। উনি এখানেই থাকেন এখন। একসময় দিল্লীতে থাকতেন।

মন্নু বলল, এইখানে ? এই গ্রামে ? এই গ্রামে ওঁর মতো বড় লোক থাকতে সুরাই-এর মতো ভত গরিব একটা লোক খুন হয়ে গেল ? ভারি আশ্চর্য তো ! উনি আটকাতে পারলেন না ?

নন্দবাবু, চাঁদবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কি উনি কোনো কিছু বলেছেন ? স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন কোনো ?

না স্যর ! আমি যখন মার্ডারের খবর পেয়ে এখানে এসে, অন্যান্য অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করে, ডেডবডি গরুর গাড়িতে চাপিয়ে আবার বিড়াতে ফিরে যাই. তার মধ্যে উনি একবারও আসেন নি। আমার মতো দারোগার পক্ষে কি একজন এক্স-এম-পির বাড়ি গিয়ে নিজে থেকে ডিপোজিশান নেওয়া ঠিক হতো ? স্যার, ওঁরা হলেন গিয়ে কত বড় লোক ! আর আমরা চুনোপুঁটি ! উনি ইচ্ছে করলে হয়তো কালই ঐ অপরাধে আমাকে বদলি করিয়ে দেবেন কোনো বাজে জায়গায়। আপনি তো জানেন, আমার স্ত্রীর শরীর কী খারাপ যাচ্ছে। বিপদ হয়ে যেত। তাছাড়া, ওঁকে এই মার্ডারের মধ্যে টানারই বা দরকাব কী ?

নন্দবাবু একটু ভেবে বললেন, তা অবশ্য ঠিক। উনি তো খুব ওয়েল কানেক্টেড্ বলেই শুনেছি। আর তেমন না হলে কি আর এম-পি হতে পারেন কখনো? দিল্লীর মসনদে কি আলতু-ফালতু লোক যেতে পারে? এই ডামাডোলে তো এম-পি-রাই রাজা। তাঁরাই তো আসল লোক।

কোনো মানুষই এমনি-এমনি বড় হয় না জীবনে। গুণ থাকা চাই।

এইটুকু বলে, একটু থেমে, রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি বলেন?

কারেক্ট।

রাজু বলল। গুণ না থাকলে, ডেডিকেশান না থাকলে, কেউ নেতা হতে পারে?

মন্নু বলল, নন্‌সেন্স! আমি যাঁর কথা হচ্ছে তাঁকে দেখিনি, জানি না, কিন্তু আমি অনেক এম-পিদের জানতাম এবং জানি! বাট ফর দ্যা পলিটিক্স ইন দিস রেচেড কান্ট্রি, সাম অফ দেম উড হ্যাভ বিন স্টার্ভিং। মেনী অফ দেম আর ইন্‌কেপেবল অফ আর্নিং আ লিভিং।

মন্নুর এই সাংঘাতিক কথায় জীপশুদ্ধু লোক ঠাণ্ডা মেরে গেল। রাজু শুদ্ধ। যা-তা বলে ছেলেটা!

মন্নু আবার স্বগতোক্তি করল, ইয়েস্! ইনকেপেবল অফ আর্নিং ইভিন আ লিভিং। মাসে দুশো টাকার যোগ্যতাও .....

কনস্টেবল জীপটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের নিচে দাঁড় করাল।

নন্দবাবু নেমে বললেন কিন্তু প্রত্যেক এম-পি-ই একরকম নন। এখনও কিছু ভালো লোক আছেন, তাই দেশটা চলছে কোনোক্রমে।

মন্নু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেসই করা হয়নি। ঐ এম-পি কোন্ পার্টির?

উনি ছিলেন কংগ্রেসেরই।

মন্নু বলল, কোন্ কংগ্রেস? ইউ, ভি, ডাব্লু, এক্স, ওয়াই, জেড? আই, জে, কে, এল, এম, ও, পি? হুইচ?

নন্দবাবু রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, মনুবাবু কি কম্যুনিস্ট নাকি? কংগ্রেসের উপর ভীষণ রাগ দেখছি।

রাজু বলল, ও যে কী, তা ও নিজেই জানে না। এটুকু বলতে পারি যে, ওর মাথার গোলমাল আছে।

রাজু তারপর বলল, তোর জেলে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোর প্রাণও যেতে পারে মনু। সাবধানে থাকিস।

মনু বলল, দূর দূর। জেলের ভয় দেখাস না আমাকে। প্রাণের ভয়ও দেখাস না। আমি বাঙালীর বাচ্চা। ঠিক-বেঠিক জানি না। সেদিনও ঐ দুবলা-পাতলা বাচ্চা-বাচ্চা নকশাল ছেলেগুলো ভুল লোকদের মেরেও প্রমাণ করে দিয়ে গেছে আবারও যে, বাঙালী এখনও মরে যায়নি। বাঙালী নিভেও যায়নি। আগুন তুষ-চাপা হয়ে আছে শুধু।

তুই ভুলে যাচ্ছিস যে, এটা বাঙলা নয়— যাঁরা তোকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁদের সামনে বাঙালী-বাঙালী বলে চেঁচাচ্ছিস কেন? তোর কি কোনো কমনসেন্সও নেই? চাপা গলায় রাজু বলল।

রাজু আর মনুর কথাবার্তা আর এগোলো না। গ্রামের লোকেরা তিন-চারটে চৌপাই বের করে দিল। তার একটাতে বসে পড়ে রাজু মনুকে বলল, তোরা যা মার্ডারের স্পট দেখতে। আমি ওর মধ্যে নেই।

মনু বলল, ঠিক আছে। ক্যামেরাটা দে।

জীপের পিছন পিছন একটা ভ্যান আসছিল। চাঁদবাবু ভ্যানের কনস্টেবলদের বললেন, একটা লিস্ট দিয়ে যে, সেই লিস্টে যাদের নাম আছে – তাদের সবাইকে এই নি গাছতলায় জীপের সামনে হাজির করতে। ডিপোজিশান নেবেন উনি ফিরে এসে।

নন্দবাবু বললেন, চালন্তু।

নন্দবাবু, চাঁদবাবু, ছোট-দারোগা এবং মনু রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে গিয়ে পথের পাশে কিন্তু ধানক্ষেতের মধ্যে একটা কুয়োর পাশ দিয়ে বাঁদিকে ধানক্ষেতে নেমে গেলেন।

কনস্টেবলরা কেউ কেউ গাড়ি থেকে নেমে দূরে দাঁড়িয়ে রইল, সাহেবদের সঙ্গী হিসেবে রাজুকে সম্মান দেখিয়ে। অন্যরা গেল সাক্ষীদের ধরে আনতে।

এখন হেমন্ত। ভর দুপুরের রোদটা মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। নিম-গাছের ডাল-পালার ফাঁক-ফোঁক দিয়ে রোদের টুকরো-টাকরা এসে পড়েছে নিচে।

রাজু চৌপাইয়ে বসে সামনে তাকিয়ে দেখল প্রায় আদিগন্ত ধান ক্ষেত। সত্যিই রক্তের মতোই লালরঙা পাকা লাল ধানে ক্ষেত ভরে আছে। দিগন্তরেখা আকাশে মেশেনি। মিশেছে গুড়ুংগিরি-ঘাটি রেঞ্জে—আর হাতিঝোড়া আর বিড়ুর মধ্যের পিচ রাস্তার ওপারে। কী আশ্চর্য সুন্দর উদার প্রকৃতি এখানে। কী শান্তি! পিছনের ঝোপ-ঝাড়ে ঘুঘু ডাকছে। মেয়েরা পথ দিয়ে যাচ্ছে-আসছে।

একটি মেয়েকে বড় চোখে ধরল রাজুর। এমন ফিল্মস্টারের মতো ফিগার আর প্রদীপ শিখার মত মুখশ্রী নিয়ে মেয়েটি এখানে? ধবধবে ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে মরুভূমির সাপের গায়ের রঙের মতো উজ্জ্বল বাদামী হয়েছে। টিকোলো নাক, টানা-টানা চোখ, চাবুকের মতো চিবুক। যেমন দীঘল তেমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্না। যেন কোনো মিশরীয় রাজকুমারী—কে বলবে, কোন্ অভিশাপে সে ঘুঁটেকুড়ানী হয়ে জন্মেছে এই জড়য়া গ্রামে? কে জানে তার বাবা কেমন দেখতে ছিল? বাবা সুন্দর ছিল, না মা সুন্দরী? তার বাবাই তার সত্যিকারের জন্মদাতা কী না?

বসে বসে ভাবছিল রাজু, কী সুন্দর আবহাওয়া, কী চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। যে জীবিকা ও বেছে নিয়েছে তাতে এবং ওর রোজগারের সামান্যতায় কোলকাতায় ও নগণ্য: অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখানের মতো ছোট্ট কোনো জায়গায় এসে বসবাস করলে ও নিজের অস্তিত্ব ফিরে পেত, এমনভাবে হারিয়ে যেত না। শুক্লা তাকে হেয়জ্ঞান করলেও এই মেয়েটি হয়ত করতো না। তার যা সঞ্চয় আছে, তার দাম কলকাতাতে কানাকড়ি হলেও এখানে তা দিয়েই ও

ছোটোখাটো সাম্রাজ্য গড়তে পারত। এদেরই দুঃখ-সুখের, ভড়ং হিসেবে নয়, মনে-প্রাণে একজন হয়ে গিয়ে; বাকি জীবন এদেরই জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। তাদের ছেলে কিংবা মেয়ে, পৌষের সকালে মাটির দাওয়ার সামনের গোবরলেপা ঝকঝকে তকতকে উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। ধানের গোলা থেকে ধানের গন্ধ উঠত। গরুর গায়ের গন্ধ তার স্ত্রীর পায়ের গন্ধ—পাউডার অথবা পারফ্যুমের মেকি গন্ধ নয়—সত্যিকারের গায়ের গন্ধ, যে-গন্ধে প্রত্যেক নারীই স্বতন্ত্র; অথচ যে গন্ধ, যে-সমাজে ওর বাস সেই সমাজের নারীদের শরীর থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে, সেই গন্ধ খুঁজে পেত।

হেড-কনস্টেবল ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখতে এবং সপ্রতিভ। ধবধবে ফর্সা রঙ, লম্বা, চমৎকার ফিগার, চওড়া হাড়ের সুগঠিত হাত-পা নিয়ে সবসময় সজাগ। সে এসে রাজুর হাতে একটি কাগজ দিল। বলল, স্যার, আপনি একটু দাগ দিয়ে যাবেন—এ বংশতালিকা থেকে কে কে এল তা দেখে। অন্য সাক্ষীরাও এসে যাবে এক্ষুণি।

বংশতালিকা?

রাজু অবাক হয়ে তাকাল।

হ্যাঁ। সুরাই আর সুরাইকে যারা মেরেছে তারা তো একই জাত, একই তাদের পূর্ব-পুরুষ।

রাজু ভাবছিল বসে বসে, ভাইই ভাইকে মারে এদেশে। চিরদিনই মেরে এসেছে। সে রক্তসূত্রের ভাইই হোক আর ব্যবহারিক সূত্রের ভাইই হোক। অন্ধের মতো ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান মানুষ। কে যে তাদের আসল শত্রু, তার খোঁজ না নিয়ে ভাই-ভাইয়ে হানাহানি করে মরে চিরদিন। কিন্তু এই খুন, যে-হয়েছে এবং যারা করেছে, তাদের আসল শত্রু কে? এই গ্রামেরই কোনো ক্ষমতাশালী লোক? যে, বুভুক্ষু পুরুষ আর নারীদের জীবন-যৌবন নিয়ে দাবাখেলার দানের মতো দান দিচ্ছে? কে সে? তেমন লোক তো সব গ্রামেই আছে ভারতবর্ষের। কিন্তু সেই সব লোকরাই কি তাদের আসল শত্রু? তারা চিহ্নিত হচ্ছে না কেন? শাস্তি পাচ্ছে নাই বা কেন?

রাজু ভাবছিল।

আসল শত্রু, এই সুরাইদের বুকের মধ্যের ভীরুতা। এদের জন্মগত সংস্কার, এদের অন্যায় অত্যাচার মেনে নেবার জন্ম-জন্মান্তরের আশ্চর্য, সীমাহীন, ক্ষমার অযোগ্য সহনশীলতা।

রাজুর মনে হলো, সুরাই বোধহয় মনোজের মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। অদৃশ্য শিকারী যখন বাঘকে গুলি করে, তখন গুলি-খাওয়া বাঘ গর্জন করে উঠে শরীরের যে-জায়গায় গুলিজনিত যন্ত্রণা, সেই জায়গাটিকেই যন্ত্রচালিতের মতো কামড়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে শরীর বেঁকিয়ে। সাহসী সরল বাঘ; চতুর ভীরু, আত্মগোপনকারী ইতর শিকারীর অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারে না। সে, বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারে না; আড়ালে লুকিয়ে থেকে, চোরের মতো কেউ এমন আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনতায় কাউকে আঘাত করতে পারে।

এই সুরারাও বোধহয় বাঘেরই মতো। তাদের সরল বুদ্ধিতে তারা তাদের সমষ্টির শরীরকেই মহাক্রোধে কামড়ে ছিঁড়ে নিতে গিয়ে তারা নিজেরাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, চতুর ইতর শিকারী আড়ালে বসে হাসে, বুভুক্ষু সুরাই-এর রক্তে লাল-হওয়া ধানের চালের ভাত খেয়ে গাব্দা-গোব্দা হয়। যে বড়লোক ছিল, সে আরও বড়লোক হয় এমনি করে। আর যে গরিব ছিল, সে আরও গরিব।

গ্রামের লোকেরা পুলিশ-সাহেবদের জন্যে দুটি দড়ির খাটিয়া এনে বড় নিমগাছটার ছায়ায় পেতে দিয়েছিল। তারই একটার উপর বসে ছিল রাজু। পিছনে কারো বাড়ি থেকে মুরগী ডাকছিল। ঘুঘু ডাকছিল আরও দূর থেকে। একদল মেয়ে নীরব শোভাযাত্রা করে গোবর নিয়ে, কাস্তে নিয়ে, খালি খাতে ওর সামনের পথ দিয়ে একবার যাচ্ছিল আর একবার আসছিল। তার মধ্যে সেই মেয়েটিও ছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে রাজু অপলকে মেয়েটির দিকে চাইছিল, যতবারই সে কাছে আসছিল। এবারে তার মাথায় গোবরের ঝুড়ি। আহা রে! শহরের বড়লোকের বিটিরা যদি ঘুঁটেকুড়োনীর নিরাবরণ, নিরাভরণ রূপ

দেখতে পেত, তাহলে তারা লজ্জায় মধ্য কলকাতার দোকানে গিয়ে চুল-ছাঁটা আর চুল-বাঁধা আর ভুরু-তোলা আর হাত-পায়ের রোম-তোলা সব বন্ধ করে দিত।

হঠাৎ রাজুর মনে হলো, শুক্লার সৌন্দর্য তো মালটি-স্টোরিড বস্তি-লালিত বাড়ির ফ্যাকাশে মেকি সৌন্দর্য। মিথ্যা। মাটির রঙ-রস-রূপ-গন্ধ কিছুই নেই তার মধ্যে।

এ কথাটা মনে হতেই হঠাৎ একটা নাড়া খেল রাজু। নিজের বুকের মধ্যে অন্য একটা বুক, নিজের মনের মধ্যে অন্য একটা মন হঠাৎ ভাস্বর, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। আবিষ্কার করল সে, তার আসল সত্তাকে। হুলো বেড়াল যেমন নিজের বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে ঘাড় মট্‌কায় এক ঝটকায়, তেমন করেই তার পুরনো, নরম তুলতুলে মেকি-সত্তাকে সুরাই নামক এক অপরিচিত যুবকের মৃত্যু কোনো অদৃশ্য হুলো বেড়ালেরই মতো হঠাৎ কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে নতুন প্রাণ দিল যেন।

রাজু, এই গ্রামীন জীবনের, ধানের জন্যে এমন খুনোখুনির কথা কখনও সখনও কাগজে পড়েছে বটে, কিন্তু এর স্বরূপ সম্বন্ধে কোনোই স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার।

হতবাক হয়ে বসে ছিল ও হেমন্তের দুপুরের মিষ্টি রোদে রক্তের রঙে লাল ধানক্ষেতের ঢেউ পেরিয়ে দূরের আবছা কালো আর নীল গুড়ুং গিরিঘাটির পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে। ঐ দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চশমার আড়ালে ওর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

রাজুরা জাতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মানেই দ্বিজ। উপবীত ধারণের সময় তাদের নতুন করে জন্ম হয়। রাজুর মনে হলো আজ ও তৃতীয়বার জন্মাল। ত্রিজ হলো!

হেড কনস্টেবল ডাকল, স্যার!

ভাবনার ঘোর ভেঙে রাজু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও ভাই! কাগজটা দাও!

বলে, কাগজটা মেলে ধরল খাটিয়ার উপর। তারপর পাঞ্জাবীর বুক পকেট থেকে কলম বের করল। চশমাটা মুছে নিল।

প্রকাণ্ড বংশতালিকাটা পুরো মেলে ধরে চোখ বুলোতে লাগল তার উপর।

॥ ৪ ॥

মনু, সার্কল ইন্সপেক্টর এবং ও-সির সঙ্গে কুয়োর পাশ দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে ওঁদের সঙ্গে আগে আগে চলতে লাগল। ওর ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে গেল। কটকে মামাবাড়িতে থাকাকালীন মামাদের জমিজমা ছিল ঢেন্‌কানলের কাছে। সেখানে যেত প্রতিবছর পরীক্ষার পরের ছুটিতে। বড়মামার বন্দুক দিয়ে একবার ঢেন্‌কানলের জঙ্গলে একটা ছোট খুরান্টি হরিণ মেরেছিল মনু। মাউস-ডিয়ার! মামার তৈলাতে রাতে হাতীও আসত। বন্দুকের আওয়াজ করতে হতো রাত জেগে বসে—আছাড়ী পটকাও ফাটাতে হতো।

মনু বলল, এখানে হাতীর উপদ্রব নেই?

নেই আবার? চাঁদবাবু বললেন। তবে হাতী বেশি গুড়ুংগিরি ঘাটি আর বিড়ুর দিকে। জুরুয়া গ্রামটা বেশ ভিতরে বলে হাতী এত দূর বড় একটা আসে না। আমাদের যদি আজ ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়, তবে পথেই হয়ত হাতী পড়বে। একটা হাতী আছে খুব খারাপ। একলা হাতী। ইয়াব্বড় বড় দাঁত। সেটা পড়লেই মুশকিল। গতবছর এক সন্ধেবেলায় সাইকেল করে থানা থেকে বাড়ি যাচ্ছিলাম—ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল থানাতে এবং বাড়িতেও বাড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে গেছি, এমন সময় হাতীটা আপনারা যে বাংলোতে আছেন মনে হলো যেন সেই বাংলোর মধ্যে থেকেই দৌড়ে এল।

নন্দবাবু উৎসুক হয়ে বললেন, তারপর কী হলো?

তারপর আর কি, আমি তো সাইকেল ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চম্পট। কিন্তু সাইকেলটা একটা লাট্টুর মতো ছোট করে পাকিয়ে গোল করে রেখে গেছিল রাস্তায়।

চাঁদবাবুর বড় নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি কিন্তু বেশ ফিট আছে। খুব জোর হাঁটতে পারেন! জীবনীশক্তিতেও ভরপুর।

মনু ভাবছিল, জীবনীশক্তি ব্যাপারটা আলাদা। রোগা মোটা সুপুরুষ কুপুরুষ কোনো কিছুর উপরই তা নির্ভর করে না।

নন্দবাবু অধ্যাপকেরই মতো। চালচলন, কথাবার্তা। ছিপছিপে, সুন্দর ফিগার। মাথার সামনের দিকে টাক, তীক্ষ্ণ নাক, মিষ্টি মুখশ্রী।

আগে আগে চলে চাঁদবাবু তাদের অনেকক্ষণ হাঁটিয়ে এনে একটা ছোট ক্ষেতে পৌঁছলেন। ক্ষেতটা লম্বা-চওড়াতে সামান্যই। কিছু কাটা ধান পড়ে রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে। এক জায়গায় জমি লাল হয়ে রয়েছে রক্তে। অসময়ে বৃষ্টি হওয়াতে জমি তখনও ভিজে ছিল ক্ষেতের মধ্যে নিচু জায়গাতে। সেই ভেজা জায়গায় রক্ত জমে একটা ছোট পুকুরের মতো হয়ে রয়েছে।

মনু একটা ছবি তুলল রাজুর ক্যামেরা দিয়ে। শখ করে কালার্ড ফিল্ম পুরেছিল রাজু। ভাবেনি, মানুষের রক্তের ছবি তুলবে। এদিকে আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু। কে জানে, উঠবে কিনা ছবি।

ওঁদের পিছনে পিছনে দুজন কনস্টেবল এসেছিল। ক্ষেতটার গায়েই একটা গাছ ছিল। ছোট। কিছু ইতস্তত কালো পাথর এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল, একফালি উঁচু জায়গায়। ঐ জায়গাটা পাথুরে বলে বোধহয় চাষ হয় না সেখানে।

চাঁদবাবু নন্দবাবুকে বললেন, দেখুন স্যার, এইখানে সুরাই আর ওর বাবা দুনা ধান কাটছিল। বাড়ির মেয়েরাও, মানে সুরাই-এর মা, সুরাইয়ের চারদিনের পুরনো বৌ, সালাই-এর বৌ সকলেই ধান কাটছিল। মেয়েরা আর সালাই বাড়ি গেছিল পোকাল খেতে আর সুরাই ও সুরাইয়ের বাবার জন্যে পোকাল নিয়ে আসতে। ঠিক সেই সময়ই সুরা, সিথা নান্ধু, মাকড, তুরী, হোড়িং আর পাগা দুদলে ভাগ হয়ে, একদল কুয়োর পাশ দিয়ে আর অন্যদল গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে ক্ষেতে ঢুকে, সাইড থেকে ওদের অ্যাটাক করে।

নন্দবাবু বললেন, সুরাইয়ের অন্য ভাই তখন কোথায় ছিল?

ও তো এখানে থাকে না। হাতীঝোড় না বাদমা, কোথায় যেন কাজ করে।

তারপর? নন্দবাবু শুধোলেন।

তারপর ওরা ধানের মধ্যে গুঁড়ি মেরে মেরে আসতে থাকে। ধানের মধ্যে আলোড়ন দেখে বাপ-বেটা দুজনেই বিপদ বুঝে দৌড়ে পালায়। কিন্তু সুরার দল কুয়োর সামনে সুরাইকে ধরে ফেলে। বাপ দুনা দৌড়ে বাড়ি পালায়। ওদের রাগটা হয়ত সুরাইয়ের উপরেই বেশি ছিল।

তারপর?

সুরাইকে ওরা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে আল দিয়ে এই এতখানি নিয়ে আসে। যেখানে ওরা ধান কাটছিল।

সুরাইকে সুরা বলেঃ এবার বল তুই কার বাপের জমিতে ধান কাটছিলি?

সুরাই চেঁচিয়ে বলেঃ তোর বাপের জমিতে নয় রে, তোর বাপের জমিতে নয়।

ততক্ষণে ওদের অন্য দলও সেখানে পৌঁছে যায়। সুরা তার হাতের খাঁড়া দিয়ে সুরাইকে ঘাড়ে কোপাতে থাকে। অনেক কোপ মারলে তবে সুরাই নিস্তব্ধ হয়। অন্যদের মধ্যে একজন ওর গলাতে কাছ থেকে পরপব দুটি তীর ছোঁড়ে।

সুরাইয়ের বাবা বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে ছোট ছেলে সালাইকে খবর দেয় যে, ওরা বোধহয় সুরাইকে মেরেই ফেলল এতক্ষণে।

সালাই দাদাকে বাঁচাতে প্রাণপণে দৌড়ে আসে। তখনও সুরাই মরেনি। সুরাই তার ভাইকে আসতে দেখে চিৎকার করে বলে, 'পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, ওরা তোকেও কেটে ফেলবে। আমি চললাম রে। ডাম্বইকে বলিস। বাবাকে বলিস।'

ডাম্বই কে? নন্দবাবু শুধোলেন।

ডাম্বই, ওরফে কুন্‌কি; সুরাইয়ের বৌ। গান্ধর্বমতে বিয়ে করে অন্য গ্রাম থেকে চার দিন আগে সুরাই নিয়ে এসেছিল ওর বৌ ডাম্বইকে

এ গ্রামে। ধান কাটতে সাহায্য হবে বলে। একজোড়া হাতের দাম যে অনেক।

মন্নু ভাবছিল, বড়লোকের মেয়ে মালতী প্রায়ই বলে, বিয়েব পব ওরা ওড়িশার গোপালপুর-অন-সীতে ওবেবয়ের পাম-বীচ হোটেলে হানিমুন করতে আসবে। এখানেও সুরাই আর ডাম্বইয়ের হানিমুনে কিন্তু অনেক চাঁদ ছিল। আজ অথবা কালই বোধহয় পূর্ণিমা। কিন্তু চাঁদের দিকে তাকাবার সময় এই মানুষগুলোব নেই; নতুন বৌকে সোহাগ করারও নয়। ধানের স্বপ্নই ওদের একমাত্র স্বপ্ন। একজোড়া হাত দিয়ে ওরা ধান কাটে, গোবব বয়, গরু দোয়—সেই হাত সোহাগভরে বৌয়ের বুকে রাখার সময় কোথায় ওদের? ওদের চাঁদে মধু নেই, রক্ত আছে, বড়ই তেতো চাঁদ সে!

মন্নুর মাথার মধ্যে যে রাগের পোকাগুলো থিকথিক করে সেই পোকাগুলো আবার জেগে উঠল। কে যেন কানের কাছে বলল, "মিস্টার পারেখ, প্লিজ ডোণ্ট টক অফ ন্যাশনাল ইণ্টাবেস্ট ইন ডেল্লী। পিপল উইল কনসিডার ড্যু টু বী আ ফ্রড। আ টোটাল ফ্রড।"

দেশ স্বাধীন হবার পঁয়ত্রিশ বছর পরও—এই মহান গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকদের মুখে এই কথা।

রাগের পোকাগুলো লাফাতে লাগল। মনে হলো, মন্নুব মাথার মধ্যে শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে।

নন্দবাবু আবার শুধোলেন, ওয়্যার দে সোবাব? দ্যা অ্যাকিউজড?

না স্যার। ওরা সকাল থেকেই হাড়িয়া খাচ্ছিল। ভাইকে মাবার মতো মনের জোব, হাতেব জোর বোধহয় ওদেব ছিল না। তাই বোধহয় নিজেদের ইচ্ছা করে উত্তেজিত করছিল ওবা সকাল থেকে—যাতে ওদের বিবেক, ওদের ভালোবাসা, ওদেব শুভাশুভজ্ঞান সব লোপ পেয়ে যায়।

মন্নু বলল, কে ওদের হাঁড়িয়া খেতে পয়সা দিয়েছিল? আমার মনে হচ্ছে, এই মার্ডারের পিছনে অন্য কারো হাত আছে—যে হাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লেলিয়ে দেয়, যে হাত গরিবেব বিরুদ্ধে গরিবকে

উত্তেজিত করে তুলে নিজেদের হাত শক্ত করে, স্বার্থ জোরদার করে।

নন্দবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, প্লিজ কীপ্ কোয়াইট্। আমরা আমাদের কাজ করছি, খুব দায়িত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি আপনার মতামত আপনার গলার মধ্যে চেপে রাখুন। বক্তৃতা করার সময় বা জায়গা এটা নয়। আপনার মতামত বাইরে আনবেন না। আমরা এসব শুনতে চাই না। আমরা পুলিশের অতি সামান্য সব কর্মচারী। কলমের এক খোঁচায় আমাদের চাকরি যেতে পারে, যায়ও। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। আপনারা কলকাতা শহরের বড়লোকবাবু। আপনাদের এসব সখের দরদ দিয়ে কি এদের কোনো সত্যিকারের উপকার হবে? মিছিমিছি কেন আমাদের কাজে ব্যাঘাত করছেন?

মন্নু বলল, সরী।

বলেই, চুপ করে গেল।

বুঝল যে, এই সামান্য সার্কল ইন্সপেক্টর আর দারোগার ক্ষমতা সত্যিই কতটুকু। নিজেদের কাজ নিয়মমাফিক করা ছাড়া আর কিই বা বেচারারা করতে পারেন? তার মালিক মিস্টার পারেখের মতো, তার নিজেরই মতো, এঁরাও হয়ত বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু নিরুপায়! ছেলে-পেলে আছে, বৌ আছে, চাকরি গেলে মন্নুর মতোই না খেয়ে থাকতে হবে এঁদেরও।

সুরাই আর সুরারা একটা জাত। আর ওরা সকলে অন্য একটা জাত। বৌ-বাচ্চার কথা ভেবে, চাকরির কথা ভেবে ওদের চুপ করেই থাকতে হয়; হবে।

মাথার মধ্যে রাগের পোকাগুলো আবার ধেই ধেই করে নাচতে থাকে।

মন্নু জানেনা যে, প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে কি ভাবছিল সুরাই? সুরাই নিশ্চয়ই জানত যে, ওর আসল শত্রু ওর হাড়িয়া-খাওয়া ছেলেবেলার খেলার-সাথী সমবয়সী ভাইয়েরা নয়। আসল শত্রু অন্য কেউ। সুরাই কি জানত সেই শত্রুকে?

মন্নুর খুব জানতে ইচ্ছে করছিল সেই লোকটা কে বা কারা ? কিন্তু জেনেই বা কী করবে ? খুন করবে তাদের ? কিছুই করতে পারবে না, জানে ও। শুধু মাথার মধ্যের পোকাগুলোর নাচ আরও জোর হবে, শিরা আরও দপদপ করবে।

শালপাতায় মুড়ে, সুরাই-এর রক্ত নিয়ে আসতে বলে দিলেন চাঁদবাবু কনস্টেবলদের দু-তিন জায়গায় আলাদা করে। কেস-এ লাগবে—প্রমাণ হিসেবে সুরাই-এর রক্তে তখনও চুপচুপে ভেজা কয়েক আঁটি কাটা ধানও নিয়ে আসতে বললেন উনি।

তারপর গ্রামের দিকেই ফিরে চললেন ওঁরা সকলে। ওঁদের পিছনে পিছনে চলল, অপরাধীর মতো শোকাহত, নিরুপায়, রুদ্ধক্রোধ মন্নু !

পুলিশের লোকদের এসবে অভ্যাস হয়ে যায় বোধ হয়। খুন, বলাৎকার, রক্ত, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার এসব দেখে দেখে তাঁদের মনে আর কোনো তাপ-উত্তাপ থাকে না। ডাক্তারদের যেমন অসুখে-বিসুখে, ব্যবসাদারদের যেমন ব্যবসার অন্তর্নিহিত, দুঃখময়, নিরুপায় বিবেকহীনতায় পুলিশদেরও তেমনই।

খররোদে যেমন ক্ষেতের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তেমনিই দুর্নীতি আর স্বার্থপরতার রোদে বিবেক প্রতিনিয়ত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে এ দেশ থেকে। বিবেকের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এখন খরা ; বড় দারুণ খরা।

কুয়োর পাশ দিয়ে গিয়ে লাল মাটির কাঁচা রাস্তায় পড়ে ওরা জীপের দিকে চলল।

দূর থেকেই দেখা গেল স্ত্রী-পুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়েদের বেশ একটা জটলা হয়েছে নিমগাছতলায়।

চাঁদবাবু বললেন, সাক্ষীরা বোধহয় এসে গেছে।

ভাল। নন্দবাবু বললেন।

মন্নু বলল, গ্রামে এত বড় একজন মান্যগণ্য লোক থাকতে তাঁকেই আপনারা ডাকলেন না ? তাঁর মতামতের দামই তো সবচেয়ে বেশি।

উনি নিশ্চয়ই আসল ঘটনাটা কী, কে এই খুনের পিছনে তা আপনাদের বলতে পারতেন। এটা আপনারা ঠিক করলেন না কিন্তু।

নন্দবাবু বললেন, আমরা কি করব না করব তা আমাদেরই করতে দিন। আপনাকে সঙ্গে এনে দেখছি, আমাদের কাজ করাই মুশকিল হলো।

চাঁদবাবু বললেন, অত বড় মানী লোককে আমাদের মতো চুনো-পুঁটিদের কিছু বলতে যাওয়া শোভন নয়। তাঁকে বিরক্ত করাও শোভন নয়। সকালে মার্ডারের খবর পেয়ে যখন এসেছিলাম তখন উনি গ্রামে ছিলেন, কিন্তু আসেননি! দেখি, যদি বিকেলে আসেন। উনি নিজে কিছু বললে তবেই তা শোনা যাবে। আমাদের পক্ষে কিছু জিজ্ঞেস করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? এটা আপনাদের কাজ নয়?

চাঁদবাবু বললেন, সত্যিই আপনি বাড়াবাড়ি করছেন।

নন্দবাবু বললেন আমাদের বলছেন কেন? আমাদের বলা সহজ বলে? কার কি করা উচিত সে কথা আপনারা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কি ভুবনেশ্বরে কি দিল্লীতে গিয়ে বলেন না কেন? সকলের যা করা উচিত প্রত্যেকেই কি তা করছে? আমাদের নিয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ আপনি?

রাজু দূর থেকে দেখতে পেল, ওরা সকলে ধানক্ষেত থেকে উঠে রাস্তায় এসে পড়ল।

দুপুর এইমাত্র মরে গেল। এখন বিকেল। সুরাইও মরে গেছে। মরা রোদ চারপাশে।

ভিড়ের মধ্যে একটি নোংরা নীল শাড়িপরা কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েকে দেখিয়ে হেড কনস্টেবল বলল, এই যে স্যর! ঐ হচ্ছে সুরাই-এর বৌ।

রাজু ভাল করে তাকিয়ে দেখল। কান্নায় চোখ লাল হয়ে আছে। রাজু জানে, চোখদুটি বেশিক্ষণ লাল থাকবে না। কাঁদার সময় কোথায় ওদের? মূক, মূঢ়, ভাষাহীন, প্রতিবাদহীন গরুছাগলের

মতো একদল স্ত্রী-পুরুষ বোবার মত দাঁড়িয়ে-বসে আছে নিমগাছ তলায়। বাচ্চাগুলো ঘং ঘং করে কাশছে, নাক দিয়ে সর্দি গড়াচ্ছে।

কনস্টেবল একজন বয়স্কা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, ঐ সুরাই-এর মা।

সেও একটা ভীষণ নোংরা কালো শাড়ি পরে একটি সিকনিগড়ানো বাচ্চাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য! তার চোখে একটুও জল নেই। সে-যে আগেও কেঁদেছে এমনও মনে হলো না চোখ দেখে। দুটি চোখ শুকনো, খটখটে। চোখে জ্বালাও নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই, শুধু নির্লিপ্ত আছে—ভাগ্যের হাতে বিনাবাক্যে নিজেদের সবকিছু সঁপে দেওয়ার সাক্ষী যেন চোখ দুটি।

হঠাৎই রাজুর কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল। 'A single spark can start a prairie fire ..our force although small at present, will grow rapidly.' কিন্তু এমন কোনো আগুন কি আছে যে, এই অদাহ্য জড়বুদ্ধিদের জ্বালাতে পারে? কে সেই আগুন জ্বালাবে? রাজু? মন্নু?

অপদার্থ! তারা, অপদার্থ একেবারে।

একসময় অনেকই পড়াশোনা করত রাজু। কত লোকের লেখা যে, হঠাৎ কোথা থেকে পরিযায়ী পাখিদের মতো একে একে স্মৃতির দাঁড়ে এসে বসতে লাগল এই অসময়ে, অস্থানে; ঝাঁকে ঝাঁকে। হঠাৎ। তারা যে তার মস্তিষ্কে, তার অবচেতনে এমন দৃঢ়মূল হয়ে এতদিন ছিল; থাকবে, তা কখনও মনে হয়নি রাজুর। ও সেইসব কথাকে ভুলে গেছিল ক্যাডবারী চকোলেট, দার্জিলিং-এর চা, ডেইণ্টি-ক্রীম বিস্কুট, আর ব্রয়লার চিকেন বিক্রী করতে করতে।

অবাক হয়ে গেল ও। ও তাদের ভুলে গেছিল, কিন্তু তারা ভোলেনি তাকে।

ওরা এসে গেলেন। চাঁদবাবু, নন্দবাবু ছোট-দারোগা সকলেই খাটিয়াতে বসলেন। মন্নুও বসল! মন্নুর চোখ-মুখ কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে।

চাঁদবাবু কাগজ-কলম বের করলেন। হেড কনস্টেবলকে বললেন,

ডাকো, সাইকেল-সারাই-এর দোকানীকে।

খালি গায়ে, গামছা পরা একটা কালো-কোলো রোগা, মাঝবয়সী লোক এসে উবু হয়ে বসল দারোগাবাবুর সামনে, নিমগাছতলাতে।

তোর নাম ?

নাম বলল।

বাবার নাম ?

বাবার নাম বলল।

সকালে তোর দোকান খোলা ছিল ?

ছিল।

তুই কোন লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিলি ?

না বাবু। আমি গরীব লোক। আমি কিছু দেখিনি।

চাঁদবাবু বললেন, দ্যাখ তুই গরীব লোক, যেমন জিগগেস করছি তেমন জবাব দে, যাতে কেসের সুবিধা হয়। তুই তো আর খুন করিসনি। আর যারা করেছে তারা তো নিজেরাই কবুল করেছে যে, খুন তারা করেছে। তারা তো সব হাজতে। ভয় কি তোর ? যারা খুন করেছে, তারা বলেছে যে, তুই ওদের দেখেছিস। আর তুই বলছিস দেখিসনি।

একটু থেমে বললেন, থানায় নিয়ে গিয়ে এমন পেটান পেটাব যে, বাপ বাপ করে সব বলবি। ভালো চাস তো ঠিক ঠিক জবাব দে।

হ্যাঁ বাবু।

কারা তোর দোকানের সামনে দিয়ে দৌড়ে গেছিল ? কটার সময় ?

না বাবু। আমার ঘড়ি নেই বাবু।

তুই দেখিসনি কিছু ?

না বাবু।

আবার না বাবু।

ধমকে বললেন চাঁদবাবু।

হ্যাঁ বাবু।

কি, হ্যাঁ বাবু !

না বাবু।

ছাখ, তোর কপালে দুঃখ আছে। তোর কপালে অশেষ দুঃখ আছে—এ—এ—এ · ···

হ্যাঁ বাবু।

তা বুঝিস ?

হ্যাঁ বাবু।

কারা দৌড়ে গেছিল ?

আমি ওসব দেখি না বাবু। আমি মাথা নীচু করে সাইকেলের টিউব সারাচ্ছিলাম। সাইকেলের টিউব ছাড়া আমি আর কিছু দেখিনি বাবু।

ঠিক আছে। তুই এবার চুপ কর। প্রশ্ন আর উত্তরগুলো আমি নিজেই লিখে নিচ্ছি—তুই তারপর একটা টিপসই দিয়ে দিবি। না দিলে তোকে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব আমি।

হ্যাঁ বাবু।

কি, হ্যাঁ বাবু ?

থানায় নিয়ে যাবেন না বাবু।

যা বলছি, তাই কর। তাহলে নিয়ে যাব না।

হ্যাঁ বাবু।

মন্নুর মনে পড়ে গেল ইনকামট্যাক্স থেকে তার মনিবের অফিসে আর বাড়িতে একবার রেইড হয়েছিল। এমার্জেন্সির সময়, দিল্লীর টেলিফোনিক ইনস্ট্রাকশনে। দিল্লীর এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের এক মিটিংয়ে তার রগচটা মনিব গভর্নমেণ্টের পলিসির যাচ্ছেতাই সমালোচনা করেছিলেন বলে। সেই সময় ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা যেমন জবরদস্তি ডিপোজিশান নিয়েছিলেন অফিস এবং বাড়ির বিভিন্ন মানুষদের কাছ থেকে, তার সঙ্গে পুলিশের এই প্রক্রিয়ার কোনোই তফাৎ নেই।

সুরাই খুন হয়েছে। কেন খুন হয়েছে, খুনের পিছনে গূঢ় কারণ কী? কাদের অদৃশ্য হাত সেই খুন করিয়েছে ? এসব সাংঘাতিক

ব্যাপারের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছা এঁদের আদৌ নেই। যাদের কেউ রক্ষক নেই, তাদের কাছেই গায়ের জোর খাটানো চলে—কেউকেটাদের কিছু বলা মানেই তো সাপের গর্তে হাত ঢোকান।

চাঁদবাবু বলছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই ছোট। আগামী বছর প্রোমোশনের বোর্ড—কোন তালেবর লোক কোথায় কি লাগিয়ে দেবে। ব্যস-স-স, প্রোমোশন তো দূরের কথা, চাকবি নিয়েই টানা-টানি। এদেশের আইন হচ্ছে সুরা, সুরাইদের জন্যে। ওঁর মত, রক্ষকহীন ছোট আমলাদের জন্যে। ওড়িষ্যা তো শুধু একটি রাজ্য মাত্র। সারা ভারতবর্ষেই এই অলিখিত আইন চালু। যাদের কাছে প্রচুর দু-নম্বর টাকা আছে তারা দু নম্বরি তিন নম্বরি সব অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে। কাঁচা টাকা যাদের নেই, তাদের কপালে অশেষ দুঃখ।

চাঁদবাবু এক মনে ডিপোজিশান লিখতে লাগলেন। প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই। মিনিট দশেক ধরে লিখলেন।

তারপর সাইকেল মেরামতির দোকানীর দিকে চেয়ে বললেন, কান খুলে শোন, আমি কি প্রশ্ন করেছি আর তুই কি জবাব দিয়েছিস। শুনে টিপসই দিয়ে দে। পরে আবার বলিস না যে, জোর করে লিখিয়ে নিয়েছি। কিরে ব্যাটা? বলবি নাকি?

হ্যাঁ বাবু। না বাবু।

তারপর চাঁদবাবু পর পর প্রশ্ন আর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন।

কেসটাকে শক্ত করতে হবে তো। এই-ই তাঁদের কাজ। কেস শক্ত করে বেঁধে দাও, তারপর বাঁধন খোলবার হয় তো আদালত খুলবে পয়সার জোর থাকে তো কেস লড়বে। না থাকলে, জেলে পচে মরবে। কি করার?

মন্নুর মালিকের যিনি ইনকামট্যাক্স অফিসার, তিনিও এই কথাই বলেন। বলেন, আরে মশাই ধরবার লোক আমি একা। আমি ভালো করে তেড়েফুঁড়ে জুড়ে দিচ্ছি—ছাড়াবার হলে উপরে গিয়ে ছেড়ে যাবে। অ্যাপিলেট অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার আছে। দরকার হলে কমিশনারের কাছে রিভিশান পিটিশান নিয়ে যেতে পারেন। তারপর আছে

ট্রাইবুন্যাল। তারপর হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, ছাড়িয়ে আসুন না। আমার কি ?

মন্নু বলেছিল তা বলে ন্যায়-অন্যায় কিছু নেই—অ্যাসেসমেণ্ট হবে ফেয়ার-অ্যাসেসমেণ্ট। তা না হয়ে, যা আপনি মেনে নেওয়া উচিত বলে মানেন, তাও জুড়ে দেবেন। এ কেমন হলো ?

আরে মশাই, আমি কি আপনার ভালো করতে গিয়ে নিজের নাক কাটব ? দু-দুটো অডিট আছে। এ-জি অডিট আর রেভিন্যু অডিট। অডিট নোটের আবার কোনো মাথামুণ্ডুই নেই। অডিট অবজেকশান হলেই হলো। সামনের বছর আমার প্রোমোশান ডিউ। এই সময়ে আমার পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়াই সম্ভব নয়। আসুন না, উপরে গিয়ে ছাড়িয়ে আসুন। আপনাকে ফেয়ারনেস, জাষ্টিস দেখাতে গিয়ে কি শেষে প্রোমোশানটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ? বেশ কথা বলছেন তো আপনি। শেষে ঘুষ খেয়েছি বলে বদনাম রটবে ?

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন ঃ আজকাল অনেস্ট লোকদের কোনো সাহস দেখাবার দিন নেই সারা দেশে। মশাই, সাহস যারা দেখাবে, তারা সাহসের দাম গুণে নেবে কান মলে আপনার ঠেঙ্গে। নিজের স্বার্থ ছাড়া সাহস দেখায় এমন বুদ্ধু লোক গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে এখন কড়ে-আঙ্গুলে গোনা যায়। হ্যাঁ। এক্কেরেই কড়ে-আঙ্গুলে। যা করলাম, এই অর্ডারই মাথায় করে ধন্য ধন্য বলে নিয়ে যান।

তিন লাখ টাকা তো যোগ করে দিলেন। মাথায় করে নিয়ে যাব ? মন্নু উষ্মার সঙ্গে বলেছিল।

চুরি করেনি আপনার মালিক ?

তা করেছে। কিন্তু তার বেশিটাই তো খরচা হয়ে যায় নানান জায়গায় দিতে-থুতে। না দিলে, কি কোনো কাজ হয় ? তাছাড়া আপনি তো চুরি ধরেননি—অন্ধকারে ঠুকে দিলেন—আ শট্ ইন দ্যা ডার্ক। ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রিতে ট্যাক্স-পেয়ারদের কি এইভাবে ট্রিট করা উচিত ? যাদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় দেশ চলছে, তাদের কি একটু

ভালোভাবে ট্রিট করা যায় না ?

জান তো মশাই ! মেলা ফ্যাচোর্ ফ্যাচোর্ করবেন না। দিতে-থুতে হয়, তাতো আপনি নিজেই বললেন। আমাকে যখন কিছু দেন-থোননি—আমি যখন ও লাইনের নই, তখন আমাকে এত তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন কেন ? কোনো এম-পি ধরুন, কিছু মাল ছাড়ুন তাকে। এসব বক্তৃতা তিনি আপনার হয়ে পার্লামেণ্টে গিয়ে করবেন। নয়তো, বলুন যে আপনার মালিক সলিড পোলিটিক্যাল ব্যাকিং-এর জোরে—আমার প্রোমোশন আটকালে গাড়ি পার করিয়ে দেবেন। ছিঁড়ে ফেলছি আপনার অর্ডার—ফের নতুন করে লিখে দিচ্ছি। মশাই, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। ছেলেমানুষ, আপনাকে কি বলব, কিছু না-বুঝেই একগাদা কথা বলেন। যান, আসুন এবারে।

পরে, ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিল মনু। সত্যিই তো। উনি ওঁর নিজের কথা ভাববেন বইকি। চাঁদসাহেব যেমন ভাবছেন। গভর্নমেণ্ট সারভেণ্টদের মধ্যে যাদের পোলিটিক্যাল ব্যাকিং অথবা পয়সার জোর নেই, তাদের অতিকষ্টে নিজের চেয়ারটিকে কোনোক্রমে পিঠে-বেঁধে প্রোমোশনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ক্লীন রিটায়ার-মেণ্টের বৈতরণী পার করানো ছাড়া উপায় কি ?

সকলেই নিরুপায়।

সুরাইয়ের মা, বৌ, যারা খুন করেছে, সুরাদের তারা প্রত্যেকে, চাঁদসাহেব, মনু নিজে, এই সাইকেল-মেরামতির দোকানের মালিক, গামছা-পরা মাঝবয়সী সাক্ষী, মনুর কোম্পানীর ইনকামট্যাক্স অফিসার প্রত্যেকেই যার যার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরুপায়। যার পোলিটিক্যাল ব্যাকিং নেই, তার কিছুই নেই। যার দু' নম্বর টাকা নেই, তারও কিছুই নেই। আর যাদের এই দুইয়ের কিছুমাত্র নেই সে নিঃস্ব।

চাঁদ সাহেব বললেন, নে। এবার টিপ্ সই লাগা তো।

বলেই, বললেন, অ্যাইরে ! স্ট্যাম্প-প্যাড তো থানায় ফেলে

এসেছি। কই রে? কার বাড়ি কাজল আছে? কাজলদানিটা নিয়ে আয় ত!

কাজলদানি আনতে দৌড়লো একটি ছোট মেয়ে।

এমন সময় সমবেত নারী পুরুষ শিশুর মধ্যে থেকে চাপা, অস্ফুট শব্দ শোনা গেল কয়েকটা। একটু আলোড়ন উঠল। গভীর জলের তলায় ছোট মাছের দলে হাঙর পড়লে যেমন হয়।

সম্ভ্রমসূচক?

তাই-ই হবে।

দেখা গেল, সমবেত স্ত্রী, পুরুষ, শিশুর পোশাকের মলিন ছেঁড়া-খোঁড়া পটভূমিতে একেবারেই বেমানান ধব্‌ধবে ইস্ত্রি-করা সাদা ট্রাউজার, তার উপরে সুন্দর একটি স্ট্রাইপড টেরিলিনের হাওয়াইন শার্ট এবং পায়ে দামী চটি পরে একজন সৌম্যদর্শন, ফর্সা, মাঝারী আকারের সুপুরুষ ভদ্রলোক এদিকে আসছেন, হেঁটে; গ্রামের ভিতর থেকে।

নন্দবাবু বললেন, এক্স-এম-পি বাবু আসছেন। যার কথা হচ্ছিল।

ওঁকে দেখে দারোগা ও সার্কল ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

চমৎকার ইংরেজীতে ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, কতক্ষণ হলো এসেছেন আপনারা?

ইংরিজী তো ভাল বলবেনই। ভাল ইংরিজী বলতে না পারলে, ভাল বক্তৃতা না দিতে পারলে কি জনগণের নেতা হওয়া যায়? আমাদের নেতারা ত সায়েব-মেমই প্রায়।

উনি গ্রেসফুলি আসন নিলেন একটি নতুন খাটিয়াতে। দুঃখ করে বললেন যে, এত বছর এই গ্রামে আছেন; তবে এমন ঘটনা গ্রামে এইই প্রথম।

সার্কল ইন্সপেক্টর বললেন, ঘটনার সময় আপনি কি গ্রামে ছিলেন স্যার?

ছিলাম। ছিলাম। তবে দুঃখটা এই যে, ঘটনা ঘটার আগে আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে, কি ঘটতে চলেছে, তাহলে বন্দুক নিয়ে

এসে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে মার্ডারটা নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিতে পারতাম। সেটুকু মরাল কারেজ আমার আছে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর যখন খবরটা পেলাম, তখন মনটা এমনই খারাপ লাগল যে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজা বন্ধ করে শুড়ে পড়লাম। তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে তার কিছুই আমি জানি না।

পাশে-বসা মন্নু একবার চকিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

বাজু ওর হাতের উপর হাত রাখল। ওকে ঠাণ্ডা করার জন্যে।

মন্নু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেশলাইয়ের বাক্সর উপরে সিগারেট ঠুকে ঠুকে রাগটা ঠাণ্ডা করে ধরাল একটা।

তারপর অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে, জোরে ধোঁয়া ছাড়ল। যেন সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েই এদেশীয় অনাচারের গোয়ালের মশা তাড়াবে ও।

চাঁদবাবু বললেন, তুনস্বর সাক্ষী কোথায়?

ছেলেটা তো এখানেই ছিল। গেল কোথায়?

হেড কনস্টেবল বলল।

দেখা গেল, একটি ছেলে গ্রামের দিক থেকে হেঁটে আসছে।

চাঁদবাবু ডাকলেন, তাড়াতাড়ি আয়।

এক্স-এম-পিকে নন্দবাবু বললেন, স্যার, যা শুনলাম, তা কি সত্যি? সুরাইয়ের বসন্ত হয়েছিল, সেই কারণে ভিন্‌দেশী রোগ গ্রামে বয়ে নিয়ে আসার অপরাধে ওকে নাকি আপনারা গাঁ-শুদ্ধ লোক বয়কট্ করে একঘরে করে রেখেছিলেন? আপনাদের মতো এত লেখাপড়া জানা মান্যগণ্য লোক থাকতেও এযুগে এই গ্রামে অবিশ্বাস্য এমন ঘটনা ঘটল কি করে? আমার তো একথা বিশ্বাসই হচ্ছে না।

এক্স-এম-পি বাবু মুখ খুললেন। চমৎকার শাদা দাঁত। হাঙ্গরেরই মতো। ও দাঁতে কিছু কামড়ে নিলে শব্দ হয় না একটুও। দারুণ স্বাস্থ্য। চেহারাটাও খুবই সম্ভ্রান্ত। দেখলেই মনে সম্ভ্রম জাগে। আস্তে আস্তে. ভেবে ভেবে, খুব বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেন।

বললেন, এ গ্রামের কথা আর বলবেন না। সব আন-এডুকেটেড্ :

সুপারস্টিসাস লোকজন। এদের কথা না-বলাই ভালো। এরা মানুষ নয়, জানোয়ার।

হঠাৎ মন্নু ফস্ করে একগাল হেসে বলে বসল, এটা কি বলছেন স্যার? আপনি কি তাহলে জানোয়ারের ভোট পেয়েই পার্লামেণ্টে গেছিলেন?

মন্নুর কথায় ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। মুখটা মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে ভালো করে মন্নুকে দেখলেন। পরক্ষণেই মন্নুর হাসি মন্নুকে ফেরৎ দিয়ে বললেন, ভালই বলেছেন। কিন্তু মশায়ের পরিচয়টা জানা হলো না।

এবার নন্দবাবু আর চাঁদবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, ওঁরা কোলকাতার লোক, ইনভেস্টিগেশান দেখতে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। বিড়তে বেড়াতে এসেছেন।

এক্স-এম-পি তখনও ওঁর হাসিটা মুখে পাউডারের প্রলেপের মতো মাখিয়ে রেখেই বললেন, ও কোলকাতার লোক!

অফিসিয়াল এনকোয়ারিতে এসেছেন ওঁরা। ওঁদের সঙ্গে না আসাই উচিত ছিল আপনাদের।

চাঁদবাবু মন্নুর দিকে ফিরে বললেন, কেমন? এখন স্যারের মুখেই শুনলেন যা শোনার। আপনি যদি আর কোনো কথা বলেন তাহলে···

মন্নুও হঠাৎ ভোল পাল্টে ঝানু রাজনৈতিক নেতার মতো ফার্স্ট রেট অভিনেতা হয়ে গিয়ে বিনয়ে গলে দারুণ এক হাসি হাসল।

বলল, সরি, সরি।

তারপর এক্স-এম-পি বাবুকে বলল, আই অ্যাপোলোজাইজ টু উ্য স্যার। আমি কিন্তু কিছুই বলিনি আপনাকে। আপনি যা বলে-ছিলেন, সেই কথাটারই ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছিলাম।

এক্স-এম-পি বাবু হাসি হাসি মুখে মন্নুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মুখে কিছু বললেন না।

সুরাইয়ের বৌ ডাম্বই যেমন করে মাটিতে উবু হয়ে বসেছিল, তেমন করেই বসে রইল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, সময়, কাল, স্থান এসবের কোনো-কিছুরই কোনো মানে নেই আর ওর কাছে। এই

'জানোয়ার'দের কাছে।

রাজু জিজ্ঞেস করল, এক্স-এম-পি বাবুকে, সুরাইয়ের বৌয়ের কী হবে? মাত্র চারদিন হল নাকি বিয়ে হয়েছে?

উনি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজুকে দেখে নিয়ে দার্শনিকের গলায় বললেন, ওদের আবার কী হবে? যদি পেটে ছেলে-মেয়ে এসে থাকে, তা খালাস হয়ে গেলেই অন্য কাউকে বিয়ে করবে। য'দ না এসে থাকে, তাহলে কালও বিয়ে করতে পারে। গান্ধর্বমতে তো বিয়ে! অসুবিধার কি? তাছাড়া এখানে বাড়িতে বসে বসে তো আর কেউই খেতে পায় না। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই কাজ করতে হয়। সকলেই স্বনির্ভর; তাই স্বাধীন। কিছুই হবে না। সবই ঠিকই হয়ে যাবে। কাল থেকে কাজেও লাগবে।

আয় রে পিলা, আয়। দু নম্বর সাক্ষীকে ডাকলেন চাঁদসাহেব।

ছেলেটার বয়স হবে তেরো-চৌদ্দ। দেখে মনে হলো, হয়ত স্কুলেও গেছে-টেছে কিছুদিন। চাঁদসাহেব যা জিজ্ঞেস করলেন তার পটাপট জবাব দিয়ে গেল সে। কিন্তু তার সাক্ষ্য দেবার ধরণ দেখে মনে হলো, সে যেন সুরাইকে যারা খুন করেছে তাদের ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন জেল হলে খুবই খুশী হয়। এত বেশি সপ্রতিভ সাক্ষ্য, প্রশ্নের আগেই উত্তর যে, সন্দেহ হলো কেউ আগে-ভাগেই তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে।

চাঁদবাবু ছেলেটাকে কাছে বসিয়ে বললেন, ছেলে, তুই তো খুব চালাক-চতুর আছিস। কোন ক্লাস অবধি পড়েছিস?

ছেলেটি বলল, অষ্টম ফেল।

বাঃ বাঃ, তাহলে অনেকই তো পড়েছিস রে। দাঁড়া, তোর জবানবন্দীটা লিখে ফেলি তাড়াতাড়ি। তারপর সই করে দিয়েই তোর ছুটি।

বলেই, বললেন, অ্যাই সেরেছে। সাইকেলের দোকানীর জবানবন্দীর যে একজনও সাক্ষী রাখিনি। ডাক-ডাক ব্যাটাকে—যা বাবা, ডেকে আন্ তোরা কেউ।

কনস্টেবলদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন চাঁদবাবু।

একজন কনস্টেবল চলে গেলে, শুধোলেন সাক্ষী হবে কে রে? ডাক ঐ বুড়োকে।

অন্য কনস্টেবল ডাকল তাকে।

বুড়ো মতো লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বোবার মত সব দেখছিল, শুনছিল। তাকে ডাকতেই সে বলল, আমি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাপ্পা সাবধান করে দিয়েছিল যে, কোনোরকম কাগজ বা চিরকুটে কখনও যেন টিপসই না দিই। ঐ করে করেই তো আমার বাপ্পার জমি-জমা সব বেহাত হয়ে গেছিল। আমার এক বিশ্বও জমি নেই। সইটইয়ের মধ্যে আমি যাব না।

চাঁদবাবু বললেন, তোর বাপ্পার তো জমিই বেহাত হয়েছিল শুধু। একটা টিপসই না দিলে তোর হাতটাই যে বেহাত হয়ে যাবে রে গাধা। কোথাকার বেজন্মা রে তুই! দারোগার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তাও শিখিসনি? সেটা বুঝি তোর বাপ্পা তোকে শিখিয়ে যায় নি?

এক্স-এম-পি বাবু ইংরেজীতে বললেন, আরে যাচ্ছে-তাই, যাচ্ছে-তাই; সব আন্-এডুকেটেড অপদার্থ!

বুড়ো তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগাবাবু বললেন, কি হলো? থানায় যাবি? গেছিস কখনও থানায় আগে? যাসনি নিশ্চয়ই। চল একবার বেড়িয়েই আসি।

হ্যাঁ বাবু। চলুন যাব।

কী বললি?

থানায় যাবি? থানায় কেন নিয়ে যায় মানুষকে জানিস?

না। জানি না। তবে জানব তো নিয়ে গেলে। সুরাকে জিজ্ঞেস করব, কেন ওরা মারতে গেল সুরাইকে। এই গ্রামে কখনও ভাইয়ের রক্ত খায়নি অন্য ভাইয়ে।

কোনো দুর্বোধ্য কারণে মনে হলো হঠাৎই চাঁদ দারোগার আত্ম-বিশ্বাস ফেঁসে গেল। এই চাঁদবাবু কিন্তু, যে উদারমনস্ক মানুষটি ডাকবাংলোয় বসে আদর আপ্যায়ন করে রাজু আর মন্নুকে দুপুরের

খাওয়া খাইয়েছিলেন, তিনি নন। যিনি ইংরেজী জানা এক্স-এম-পি বাবুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন; তিনিও নন। এখনকার মানুষটি সহায়-সম্বলহীন গরিবদের সঙ্গে অন্য ব্যবহার করেন। এক জায়গায় ভদ্র, বিনয়ী, নম্র মানুষ; অন্য জায়গায় শার্দুল শাবকের মতো তেজময়।

কিছুক্ষণ হাঁ করে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থেকে দারোগা সমবেত জনমণ্ডলীকে হাঁদার মতো মুখে শুধোলেন, বাপ্পালো বাপ্পা! এ লোকটা কে রে?

এ লোকটা সুরাই-এর গুরু।

একজন কনস্টেবল বলল।

সুরাই-এর গুরু?

বলিস কি রে! তাইই মুখে দেখছি খুবই বড় বড় কথা। চল্ ষড়া থানাতে। তোর বিষদাঁত উপড়াব আজ।

এক্স-এম-পি বাবু আস্তে আস্তে ইংরেজীতে বললেন হাসি হাসি মুখে, একে একটু শিক্ষা দিন তো ভালো করে। ও সুরাইকে নিজের ছেলের মতই ভালোবাসত!

হ্যাঁ?

হাসতে হাসতেই বললেন এক্স-এম-পি। হ্যাঁ।

মনের মধ্যে আর পেটের মধ্যে যাই-ই থাক, মুখে হাসি না থাকলে নেতা হওয়া যায় না ভারতবর্ষে।

ভাবছিল, মনু।

উনি আবার বললেন, এই গ্রামে এই দুটিই ঔদ্ধত্যের ঝাড় ছিল। একটি গেছে। এইটি আছে। তবে এর বিষদাঁত প্রায় ভেঙে এসেছে। বয়সও হলো অনেক।

রাজু এক্স-এম-পি বাবুকে শুধোল, রুট অফ ইমপার্টিনেন্স্ কেন বলছেন—মানে ঔদ্ধত্যের ঝাড়? সুরাই কি খুব উদ্ধত ছিল?

সুরাই কাউকেই কেয়ার করত না এ গ্রামে। এমন কি আমি নিজে সামনে দিয়ে গেলেও উঠে দাঁড়াত না, নমস্কার করত না; বলব কি,

আমার সামনে বিড়িও খেত। আমি অবশ্য তাতে কিছুই মনে করতাম না। আমার এডুকেশান আছে। ক্ষমা আছে। তাছাড়া, এ গ্রামের সবাই আমার-ছেলে-মেয়ে, মা-বোন।

নন্দবাবু বললেন, বিড়ি খাওয়াটা আপনি নিশ্চয়ই অপরাধের মধ্যে ধরবেন না। ওরা তো এমনিতেই সকলের সামনে বিড়ি খায়, হাঁড়িয়া খায়, এ তো আর মিডল ক্লাস এডুকেটেড সোসাইটি নয়— এদের ওসব মানামানির বালাই নেই। বাবার সামনেই বিড়ি খায় তা আর বাইরের লোক!

এক্স-এম পি বাবু বললেন, ওর বাপ তো একটা আধন্যাংটা হাভাতে মানুষ—আমি কি ওর বাপের চেয়েও বড় নয়? তবে আমি জীবনে অনেক সম্মানই পেয়েছি। সুরাই সম্মান দেখাল কি দেখাল না, তা নিয়ে কখনও আমার যায় আসেনি।

রাজু চেয়ে দেখল মনুর দিকে।

মনুর কান বোধ হয় এদিকে একেবারেই নেই। ও চেয়ে আছে দূরে, উদ্দেশ্যহীনভাবে। লাল ধানের ক্ষেত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যতদূর চোখ যায় সামনে, আর ধানক্ষেতের পর নীল ধুঁয়ো ধুঁয়ো গুড়ুংগিরি পাহাড় শ্রেণী। মনু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছে।

এক্স-এম পি আবার বললেন যে, সুরাই যত উদ্ধত ছিল আজ না কাল ও কারো না কারো হাতে মরতই। এ গ্রামেই। আমার না হয় অশেষ ক্ষমা, অসীম সহ্যশক্তি; সকলের তো আর তা নয়। সকলেই তো আর এখানে এডুকেটেড নয়।,

একটু থেমে উনি আবার বললেন, গ্রামে একটা খুন হয়ে গেল, খুবই দুঃখের কথা; কিন্তু দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। এটা আমার কথা নয়, গ্রামের সকলেই তাই বলছে। সকলের মুখেই একই কথা।

রাজু চেয়ে দেখল যারা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কারো মুখেই কোনো কথা নেই। কোনো দৈব-অভিশাপে সকলেই বোবা হয়ে গেছে।

রাজুর মনে হলো, এক্স-এম-পির কথাটা সত্যি। যে-সুরাই খুন হলো, তার শান্ত নীরব মা একটা সিক্‌নি-পড়া বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, বাচ্চাটির ওজনে একধারে বেঁকে গিয়ে সেই তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সদ্যপুত্রহারা মা, যার ছেলেকে কোপ দিয়ে দিয়ে কাটা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, যে মা তার ছেলের রক্তাক্ত বীভৎস মৃতদেহ দেখেছে তার চোখে একটুও জল নেই। মুখে বিলাপ নেই। ছেলেটা হয়তো সত্যিই এমন ছিল যে, তার মাও বেঁচে গেছে সেই হাড়জ্বালানো ছেলের মৃত্যুতে!

তুজন কনস্টেবল রক্তে ভেজা কয়েক আঁটি ধানগাছ এবং শাল-পাতার মোটা তু-তিনটি দোনাতে করে সুরাই-এর থক্‌থকে জমা-রক্ত মুড়ে নিয়ে এসে রাখল। সুরাই এর রক্ত এতক্ষণ তার মিষ্টি ধানের ক্ষেতের ধানকে আরো লাল করে জমে ছিল। এখন, যে-পথের ধুলোয় পা ফেলে সে লক্ষবার যাওয়া-আসা করেছে, শিশুকালে যে পথের লাল ধুলো ক্ষিধের জ্বালায় মুঠো মুঠো মুখে পুরেছে, যে পথে সুরাই, পাগা, হোড়িং সকলের সঙ্গে খেলা করেছে একই সঙ্গে সেই পথই তার রক্তে ভিজে উঠল।

ঠিক সেই সময় সুরাই-এর মা দৌড়ে এসে দাঁড়াল ধানের আঁটি-গুলোর সামনে।

সকলেই ওর এই হঠাৎ দৌড়ে আসায় চমকে উঠে সুরাই-এর মায়ের দিকে তাকাল।

রাজু ভাবল, এক্ষুণি আছাড় খেয়ে পড়বে হতভাগিনী ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে। মনে মনে রাজু নিজেকে সেই করুণ দৃশ্যের অসহায় সাক্ষী হবার জন্যে তৈরিও করছিল।

কিন্তু সুরাই-এর মা দৌড়ে এসে চাঁদবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চাঁদবাবুকে বলল, বাবু, অতগুলো আঁটিই কি তোমাদের দরকারে লাগবে? রক্ত তো সবগুলোতেই লেগে আছে—একটা আঁটি নিয়ে গেলেই কি হতো না? অন্য আঁটিগুলোতে যে অনেক ধান আছে! বাকিগুলো আমাকে দিয়ে দাও বাবু। অত ধান নষ্ট কোরো না।

আরে! রক্ত লেগে আছে তোর ছেলের, সেই ধান...... ?

হ্যাঁ বাবু। সেই ধান। পাকা ধান তো এমনিতেই লাল। রক্তে কিছু হবে না।

চাঁদবাবু হেসে ফেললেন।

রাজু চমকে উঠল, উনি হাসতে পারলেন বলে।

চাঁদবাবু হেসে, কনস্টেবলদের বললেন, তাই করো হে। একটা আঁটি তোমরা ভ্যানে তুলে নিয়ে বাকিগুলো ওখানেই রেখে দাও।

তারপর নন্দবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হেসে বললেন, এখানে সত্যিই ধান খুব দামী! আশ্চর্য দেশ! কী বলেন স্যার? একটা আঁটিই নিয়ে যাই?

নন্দবাবু মানুষটি ঠিক পুলিশ-পুলিশ নন। একটু নরম প্রকৃতির। মুখ নিচু করেই বললেন, আপনি যা ভালো মনে করেন। যদি এক আঁটিতেই হয়, তবে তাই-ই করুন। কেস্ ডায়ারী তো আপনিই পাঠাবেন আমার কাছে।

এক্স-এম-পি বললেন, ফিসফিস করে মন্নুকে, নাউ ড্যু সী ইন ইওর ওন আইজ, ওয়্যার আই রং ইন কলিং দেম অ্যানিম্যালস?

মন্নু ওঁর দিকে অনেকক্ষণ পূর্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কোনোই জবাব দিল না।

সার্কল ইন্সপেক্টর নন্দবাবু ঘড়ি দেখলেন।

বেলা পড়ে আসছিল। নিমগাছের ছায়াটা একেবারে সোজা, ঋজু হয়ে পড়েছিল পথে, যখন রাজুরা আসে। আস্তে আস্তে ছায়াটা ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে পুবে। লম্বা হতেও শুরু করেছে।

চাঁদবাবুও ঘড়ি দেখলেন।

বললেন, আর বেশিক্ষণ নেই স্যার। প্রায় সেরে এনেছি। আপনাকে এক কাপ চা খাইয়ে, দিন থাকতে থাকতেই বিড়ু থানা থেকে রওনা করিয়ে দেব।

নন্দবাবু বললেন, চা তো আমি খাই না। আপনি তো জানেন।

তারপর বললেন, কাজ এগোন। হাত চালান তাড়াতাড়ি।

অ্যাই বুড়ো। সেই বুড়োটা গেল কোথায়?

চাঁদবাবু এদিক ওদিক তাকালেন।

নন্দবাবু বললেন, ছেড়ে দিন ওকে। এনি উইটনেস্ উইল ড্যু। উইটনেসের ডিপোজিশানের উইটনেস্ তো! এনি ওয়ান প্রেজেন্ট হিয়ার ক্যান সাইন অ্যাজ উইটনেস।

ওকে স্যার!

বললেন চাঁদবাবু।

তারপর অন্য একজন লোককে ডেকে নিয়ে সই করিয়ে নিলেন সাইকেলের দোকানী আর ছেলেটির ডিপোজিশানে। ওদেরগুলো সই করানোর পর ডাক দিলেন সুরাই-এর বৌকে। মেয়েটা যেন অনন্তকাল ধরে বসেই থাকত উবু হয়ে, কখন দারোগাবাবুর ডাক আসে তার প্রতীক্ষায়।

ডাক পড়তেই উবু-হয়ে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে দারোগার সামনে এসে আবার উবু হয়ে বসল।

চান করেনি। বোধহয় খায়ও নি। নোংরা শাড়ি, একটা ভীষণ নোংরা শায়া বেরিয়ে আছে শাড়ির নিচে। চোখে এখন জল-টল নেই; কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, একটু আগেও ছিল। দু হাঁটুর উপর থুতনি রেখে সুরাই-এর বৌ, ডাম্বই যার নাম, আর অন্য নাম কুন্‌কি, চাঁদ দারোগার মুখে তাকিয়েছিল।

নাম কী তোমার?

নাম বলল।

স্বামীর নাম কি? সুরাই?

দারোগাবাবু শুধোলেন।

হ্যাঁ। বলল ও। মুখ নিচু করেই।

তোমার বিয়ে হয়েছে?

মাথা নাড়ল ডাম্বই।

কবে?

ডাম্বই চুপ করে রইল।

হঠাৎই দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। কী কারণে এতক্ষণ সে-ধারা যে আটকে ছিল, মন্নুর বোধগম্য হলো না।

দারোগাবাবু অত্যন্ত কনসিডারেশান দেখিয়ে বললেন, আরে কাঁদাকাঁদির কি আছে? যার যাবার সে তো গেছেই, আবার বিয়ে করে নিবি। দেশে, বরের অভাব কি রে মেয়ে? জোয়ান না পেলে, বুড়ো পাবি; পাবিই পাবি।

বলেই, হেসে সকলের দিকে তাকালেন;

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

কিন্তু যারা জটলা করে দাঁড়িয়েছিল তারা কেউই হাসল না।

রাজুর মনে হচ্ছিল, এই গ্রাম থেকে, এই ডাম্বই-এর মুখ থেকে সুরাই-এর মায়ের মুখ থেকে, কেঁ বা কারা যেন হাসিকে ডাকাতি করে নিয়ে চিরদিনের মতো পালিয়ে গেছে। হাসি যেটুকু আছে, তা শুধু আছে এক্স এম-পির মুখে। সব সময়েই আছে। প্রলেপের মতো লেগে।

অন্য কেউ না-হাসলেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলরা হেসে উঠল দারোগার রসিকতা শুনে। কুত্কুত করে। দারোগাকে খুশী করার জন্যে।

সংসারে স্নেহ, আর চাকরিতে হাসি, সততই নিম্নমুখী: ভাবল রাজু।

নন্দবাবু বললেন, প্লীজ প্রসীড্। উই আর অলরেডি লেট।

দারোগা কোলের উপর ডাইরী বিছিয়ে নিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, হুঁ-উ-উ তাহলে মাত্র চারদিন হলো বিয়ে হয়েছে তোর?

ডাম্বই থুতনিতে রাখা মুখটা এপাশ-ওপাশ করে জানাল, হ্যাঁ।

তোর মাথা নাড়া দেখে তো আমি কিছুই বুঝছি না রে। দু একটা কথা-টথা বল।

গলাটা পরিষ্কার করে ডাম্বই বলল, হ্যাঁ।

কতই বা বয়স হবে মেয়েটির? বেশি হলে কুড়ি একুশ। মেরে কেটে বাইশ। ভাবছিল রাজু।

তারপরই দারোগাবাবু বললেন, তোকে এই চারদিনের মধ্যে স্বুরাই একদিনও করেছিল ?

ডাম্বই অবাক বিস্ময়ে মুখটা তুলল জড়ো-করা দু-হাঁটুর উপর থেকে। তারপর ঐ ভাবেই তাকিয়ে রইল দারোগার দিকে। ডাম্বইয়ের ডানপাশে তার শাশুড়ী, ওমনিভাবেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল সিক্‌নি-পড়া বাচ্চা কোলে নিয়ে। তার মুখেও কোনো ভাবান্তর হলো না প্রশ্ন শুনে।

হঠাৎ—প্রশ্নটার মানে, প্রথম বোঝেনি রাজু। অথবা মন্নুও। গ্রামের এতজন স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর সামনে কেউ যে সদ্য-বিধবা একটা মেয়েকে এমন প্রশ্ন করতে পারে, একথা বিশ্বাস করতেও সময় লাগছিল। বোধ হয়, সার্কল-ইন্সপেক্টর নন্দবাবুও অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনিও নিশ্চয় খেয়াল করেননি।

দারোগাবাবুর প্রশ্ন শুনে, উধাও-হাসি গ্রামের হাসিটি এক্স-এম-পির মুখে আরও একটু উজ্জ্বল হলো। প্রদীপ শিখার মতো কাঁপতে থাকল।

দারোগা চাঁদবাবু আবারও বললেন, কী হলো ? তোকে করলে তো আর অন্য মেয়ের জানার কথা নয়। আমারও জানার কথা নয়। চারদিন বিয়ে হয়েছে আর একদিনও করলি না ? কী রে ? শরীর খারাপ ছিল ?

আঃ। সার্কল-ইন্সপেক্টর নন্দবাবু জোরে চেঁচিয়ে উঠে ইণ্টারাপ্ট্ করলেন দারোগাকে।

রেগে বললেন, হাউ ডাজ ইট কনসার্ন ইউ ? টু হোয়াট রেলেভেন্স...... ?

দারোগা লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না স্যার। ইণ্টারকোর্স হলে, প্রেগন্যাণ্ট হতে পারে। হলে, কোর্টে হয়তো ডিফেণ্ডেণ্টের উকীল জজসায়েবের সেণ্টিমেণ্টে সুড়সুড়ি দিতে পারেন। তাই ফাক্টটা রেকর্ড করে রাখছিলাম।

সার্কল-ইন্সপেক্টর রেগে বললেন, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। বাট

টু আস্ক ত্মাট গার্ল ত্মাট এমবারাসিং কোয়েশ্চেন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ভারচুয়ালী দ্য হোল ভিলেজ !·· ··আই রিয়্যালি ডোণ্ট নো···।

এক্স-এম-পিও বেশিরভাগ ইংরিজীতেই কথা বলছিলেন। প্রথমত, গ্রামের কেউই ওঁর কথা বুঝতে পারবে না। পরে, যা সত্যি-সত্যি বলেছিলেন, তার ঠিক উল্টোটা বলেছেন বলে ওদের বুঝোতে পারবেন। দ্বিতীয়ত এখন নিজের ইংরেজীর চর্চা বিশেষ নেই। মরচে ধরে যাচ্ছে ইংরিজীতে। একটু ঝালিয়ে নেওয়াও হচ্ছে।

এক্স-এম-পি সার্কল-ইন্সপেক্টরকে বললেন, বাট আই লাইক দিস চ্যাপ। দিস ও-সি অফ ইয়োরস। হি নোজ হাউ টু ইণ্টারোগেট্ অ্যাণ্ড হাউ টু ইনভেস্টিগেট আ কেস্।

রাজুর মনে হলো চাঁদবাবু এক্স-এম-পি-র সার্টিফিকেটের জন্যে লালায়িত নন। লোকটাকে হয়তো পছন্দও করেন না বিশেষ। চাঁদ দারোগা মানুষ খারাপ নন, তবে একটু ক্রুড। পুলিশের চাকরিতে নির্লজ্জতা ও ক্রুডনেস একটা গুণবিশেষ। যা কাজ ওঁদের, তাতে লজ্জা থাকলে, বেশী সফিস্টিকেশান থাকলে, কাজ করাই সম্ভব হতো না। খারাপ মানুষ হওয়ার চেয়ে ক্রুড মানুষ হওয়া অনেক ভালো।

ভাবল রাজু।

ডাম্বই ইংরিজী-টিংরিজি তো বোঝে না, তবে ওর সম্বন্ধেই যে আলোচনা হচ্ছে তা বুঝতে পেরে গুলি-খাওয়া হরিণীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই ওড়িয়া জানে। যদিও ওদের সকলেরই আলাদা আলাদা ভাষা আছে। সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, মুমু, আরও কত কি।

দারোগা মেয়েটিকে বললেন, সকাল থেকে কি কি ঘটনা ঘটেছিল সব বল একে একে।

ডাম্বই নিচুস্বরে, খুব আস্তে আস্তে এমনভাবে বাক্যগুলোকে ভেঙে টুকরো করে করে, থেমে থেকে শব্দগুলো বলছিল, মনে হচ্ছিল ও যেন ওর জিভের হাতুড়ি দিয়ে একটা নিরেট দুঃস্বপ্নকে আস্তে আস্তে ভেঙে টুকরো করছিল।

ডাম্বই যা বলল, তা মোটামুটি ঘটনার বিবরণের সঙ্গে মিলল।

ডাম্বই-এর পর সুরাইয়ের মায়ের পালা।

সুরাইয়ের মা ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দিল। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হলো যে, মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের ভদ্রলোকি শোক করার মত অবসর বা অবকাশ তাদের কারোই নেই।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হতেই সে বলল তাহলে ঐ আঁটিগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি।

আঁটিগুলো পথের উপর পড়েই ছিল। সুরাইয়ের মা মুহূর্তে সিক্‌নিপড়া বাচ্চাটাকে ডাম্বইয়ের কোলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তিন-চার আঁটি রক্তমাখা ধান নিজের কাঁধে তুলে নিল। পিছন-দিকে ধানের শীষ চুঁইয়ে টুপ টুপ করে রক্ত পড়তে লাগল পথের ধুলোয়।

রাজ. মন্নুর হাতে হাত রাখল। নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ওরা।

এনকোয়ারী. ইনভেস্টিগেশান সব শেষ হলো। এবার ওঠার পালা। রাজ ও মন্নু ওঁদের সঙ্গে জীপে উঠল। কনস্টেবলরা ভ্যানে।

এক্স-এম-পি হাত তুলে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন সকলকে।

নেতারা বড় সুন্দরভাবে নমস্কার করতে জানেন। নমস্কারের বিনম্র ভঙ্গীতে, সততা, সেবা এবং আত্মত্যাগের প্রতিশ্রুতি যেন ঝর্ণার মতো, ঝরে ঝরে পড়ে। বড় সুন্দর লাগে দেখতে।

মন্নু ভাবছিল, নেতা হওয়া কি সোজা কথা! কত গুণ থাকলে, তবেই মানুষ নেতা হয়। এম-পি হয়। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না—কে যেন বলেছিলেন?

বিবেকানন্দ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিবেকানন্দই তো!

মন্নুর মনে পড়ে গেল বিবেকানন্দই তো বলেছিলেন যে, আমাকে পাঁচটি ছেলে দাও, সৎ, পবিত্র, যারা মরতে ভয় পায় না—আমি সারা দেশের চেহারা পাল্টে দেব। ঠিক এই কথা না হলেও এরকমই

কিছু বলেছিলেন। পাঁচটি ছেলে!

মনু ভাবছিল, এত কোটির দেশে মাত্র পাঁচটি ছেলে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলে কোথায়? সবই তো রাজুদের মতো, মনুদের মতো। সুরাই যদি বেঁচে থাকত এবং বিবেকানন্দ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো সুরাই তার বেপরোয়া, স্বাধীনচেতা ও সাহসী স্বভাবের সেই পাঁচটির মধ্যে একটি ছেলে হতে পারত। কিন্তু আজকাল ওরকম ছেলেদের বাঁচতে দেওয়া হয় না। গ্রামে অথবা শহরে এক বা একাধিক অদৃশ্য এবং অতিদীর্ঘ প্রচণ্ড শক্তিশালী হাত তাদের গলা টিপে ধরে. তারপর শেষ করে দেয়। এখন সাহস; জীবনের, সমাজের; যে-কোনো ক্ষেত্রেই সাহস এবং সত্যবাদিতা এবং সততাও একটা ন্যক্কারজনক মূর্খামি বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে।. নিঃস্বার্থ সাহসের সুন্দর সব নিষ্কলুষ পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁক বেঁধে এক শীতে উড়ে গেছিল এ দেশ থেকে। ফিরে আসেনি। আর বোধ হয় ফিরবে না।

মনু, হঠাৎ ঘণ্টাখানেক থেকে বড় ডিপ্রেশান ফিল করছে। মাথায় রাগের পোকাগুলো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাগ যখন ম্যালিগ্‌নান্ট টিউমারের মতো হয়ে ওঠে—তখন সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে বলে, সে যে আছে, তাই-ই বোঝা যায় না বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর যখন টিউমারটা বার্স্ট করে, তখন রক্ত, রক্ত; চারধারে রক্ত—নাক দিয়ে, কান দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্তে রক্তে রক্তারক্তি হয়ে যায়।

জীপটা স্টার্ট করবে ড্রাইভার, এমন সময় সুরাইয়ের মা আবার দৌড়ে এসে চাঁদবাবুকে বলল, বাবু বাবু, যে-ক্ষেতে সুরাই ধান কাটছিল সেই ক্ষেতের ধানটা আমরা কাল সকালে কেটে নিতে পারি তো?

সার্কল-ইন্সপেক্টার নন্দবাবু বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ। কেটে নিস।

এক্স-এম-পি বললেন, বাঃ, তা কী করে হয়? জমির মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে গ্রামে মার্ডার হয়ে গেল। কোর্টে যে মামলা তুলবে সুরাইয়ের বিরোধীপক্ষ; কোর্ট থেকে সে প্রশ্নের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার ধান কাটবে কি করে এরা? অন্য পক্ষও তো বলতে পারে যে, কাটব! আপনি কি চান এ নিয়ে আরও মার্ডার হোক?

নন্দবাবু একটু বিরক্তিমাখা গলায় বললেন, তাহলে কি কোর্টের ফয়সালা না হওয়া অবধি জমি পড়ে থাকবে? ধান ঝরে যাবে? হাতীতে খেয়ে যাবে?

বাঃ। তা কেন? এই গ্রামে কি মাতব্বর নেই? আমি আছি কী করতে? আমি সুরাইয়ের মা, বৌ, ভাইয়ের বৌ, বাপ তুনা এবং সুরা, হোড়িং, পাগা ইত্যাদিদের মা-বৌদের দিয়ে ধান কাটিয়ে আমার গোলায় তুলে রাখব। যবে কোর্টে জমি কার সে প্রশ্নের ফয়সালা হবে, তখন যার জমি তাদের ঐ পরিমাণ ধান মেপে ফেরত দেব আমার গোলা থেকে।

সুরাইয়ের মা, যার চোখে ছেলের মৃত্যুতে এক ফোঁটাও জল ছিল না সে কাঁধে ছেলের রক্তমাখা ধানের আঁটি নিয়ে, যে-আঁটিগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল তখনও টুপ্ টুপ্ করে মাটিতে, হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। চোখে একেবারে জলের বন্যা এল।

বলল, মরে যাব বাবু, একেবারেই মরে যাব।

নন্দবাবুর একটা পা জীপের বাইরের পাদানিতে রাখা ছিল—সেই জুতো-পরা পায়ের উপর বার বার মাথা ঠুকে সুরাইয়ের মা বলছিল, সুরাই তো বেঁচে গেছে মরে গিয়ে; আর আমরা, উঃ আমরা···

সার্কল-ইন্সপেক্টর কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

এক্স-এম-পির একজোড়া চোখ বাঘের চোখের মতো সার্কল ইন্সপেক্টর নন্দবাবুর চোখের উপর স্থির হয়ে রইল।

নেতাদের চোখে সম্মোহনের ক্ষমতাও থাকে। এই প্রথম দেখল মনু। তুজনের কারো চোখেই পাতা পড়ল না প্রায় দীর্ঘ তিরিশ সেকেণ্ড।

তারপর, যা অবধারিত, যা চিরদিনই ঘটে এসেছে এই দেশের গ্রামে গ্রামে, তাই ঘটল। বিচার হেরে গেল অবিচারের কাছে।

সার্কল ইন্সপেক্টর বললেন, ধান কেটো না কেউই।

ড্রাইভার জোরে জীপের অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। জীপের চাকায় লাল ধুলোর মেঘ উড়ল। আর সেই মেঘের মধ্যে সুরাইয়ের মা, ছেলের রক্তমাখা ধানের আঁটি কাঁধে কাঁদতে কাঁদতে চুল উড়িয়ে,

আঁচল উড়িয়ে, ঝুলে-পড়া শুকনো স্তন দুলিয়ে জীপের পিছনে পিছনে দৌড়ে আসল কিছুটা। তারপর পথের উপরই পড়ে গেল।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এসে, মন্টু পিছন ফিরে দেখল. জীপের চাকায়-ওড়া লাল-ধুলো পরতে পরতে উড়ে গিয়ে থিতু হয়ে বসেছে লাল ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে। পশ্চিমাকাশে বিদায়ী সূর্যের লাল ধুলোর লাল আর পাকা ধানের লাল সুরাইয়ের রক্তের লালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে।

রাজু বলল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চ্যাটুজ্যে কোথায় যেন লিখে ছিলেন রে, 'আইন? সে তো তামাশা মাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিতে পারে।'

মন্টু বলল, ঠিক মনে নেই। বোধ হয় কমলাকান্তের দপ্তরে।

সার্কল ইন্সপেক্টর নন্দবাবু চুপ করে বসেছিলেন। নিথর; অনড়। জিজ্ঞেস করলেন, বঙ্কিমবাবু কত বছর আগে একথা লিখেছিলেন?

রাজু বলল, অনেকদিন আগে। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুই কতবছর হয়ে গেল! কিন্তু. দিন কিছুই বদলায়নি।

নাঃ। কিছুই বদলায়নি। নন্দবাবু বললেন।

তারপর মাথার টুপিটা খুলে কোলের উপর রেখে স্বগতোক্তির মতো বললেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, চাকরি ছেড়ে দিই। কিন্তু খাব কি? ভালো লাগে না।

বিড়ুগ্রাম ছাড়িয়ে পীচ রাস্তায় আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। একটু এগোতেই গুডুংগিরির ঘাটি থেকে নেমে একদল হাতী রাস্তা পেরুচ্ছে দেখা গেল।

জীপটা নিরাপদ দূরত্বে থাকতেই থামিয়ে দিল ড্রাইভার। হাতী-গুলো রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকের ধানক্ষেতের দিকে নেমে গেল।

চাঁদবাবু বললেন, যাক আপনাদের হাতী দেখা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে, রাউরকেল্লা থেকে, ওয়াইল্ড লাইফে ইন্টারেস্টেড সব বড় ঘরের বাবু-বিবিরা হাতী দেখতে আসেন প্রায়ই। না-দেখতে পেলে কী আপশোষই না করেন! বড় বড় শহরের লোকদের ব্যাপারই আলাদা।

আমরা হাতীকে ভয় পাই ; ওঁরা ভালোবাসেন।

বলেই, বললেন, আচ্ছা, শুনেছি কলকাতায় নাকি একটা অ্যানি-ম্যালস লাভার্স সোসাইটি আছে ?

সত্যি ?

রাজু অস্ফুটে বলল, আছে।

চাঁদবাবু বললেন, বড় শহরের লোকদের বুকের দরদই আলাদা। পথের কুকুরের শোকেও তাঁদের চোখে জল আসে। তারপরই বললেন, কখনও যাইনি কলকাতা। একবার যাবার ইচ্ছা আছে।

মন্নু বোধ হয় চাঁদবাবুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। ও জিজ্ঞেস করল, একটা হাতী এক রাতে কত ধান খায় ?

চাঁদবাবু বললেন, কে জানে ? এক এক রাতে ক্ষেত কে ক্ষেত সাবড়ে দেয়। চার পেয়ে, দুপেয়ে কতরকমের হাতীই আছে এই সব গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গল-পাহাড়ে। কত ধান কে খায় তার হিসাব আর কে করেছে বলুন। আমরা সব হাতীদেরই এড়িয়ে চলি।

কয়েকদিন থাকবে বলেই তো এসেছিল ওরা। জায়গাটা বড় ভালোও লেগে গেছিল। কিন্তু সব কেমন তেতো হয়ে গেল। আচম্কা ঘুষি খেয়ে মুখের মধ্যে দাঁত ভেঙ্গে গেলে, রক্ত জমে যায় যখন, যখন কথা বলা যায় না, জিভ রক্তে জড়িয়ে যায় ; তেমনি এক অদ্ভুত অসাড়তা বোধ করছিল মন্নু। কথা বলতে পারছিল না।

রাজু বলল, সকালের বাসটা কখন ছাড়ে ?

ভোর ছটায়। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় !

আমরা কাল ভোরে উঠেই চলে যাব ভাবছি।

কালই যাবেন ? থাকুন না দিন কয়েক। এখানের জল খুব ভালো। মুরগী খুব সস্তা। আর এখানের চাল বড় মিষ্টি, বলেইছি তো। খেলেনও তো আপনারা দুপুরে। থেকে যান কটা দিন। আপনাদের মতো শিক্ষিত, কালচার্ড, লেখক-টেখক তো এখানে আসেন না। থাকলে, আমাদের খুব ভালো লাগত। তাস টাস খেলা যেত।

অন্যমনস্ক গলায় রাজু বলল, দেখি···কী করি····

থানায় নেমে ওরা বাইরে কাঠের চেয়ারে বসল। সামনে একটা কাঠের টেবল। চাঁদবাবু তাড়াতাড়ি করতে বললেন একজন কনস্টেবলকে। নন্দবাবু এখুনি চলে যাবেন তাঁর হেড-কোয়ার্টার্সে।

চাঁদবাবু একজনকে বললেন, অ্যাকিউজড্‌দের একবার নিয়ে আয়। বড় সাহেব দেখে যান।

এখানে কয়েদঘর আছে? রাজু শুধোল।

কয়েদঘর? ফুঃ।

এখানে থাকার ঘরই নেই। থানা! নামেই থানা। আসলে এটা কনস্টেবলদের কোয়ার্টার। চুরি ডাকাতি-স্মাগলিংয়ের জায়গা বলে পাঁচ রাস্তায় যে চেক-পোস্ট আছে তারই দেখাশোনার সুবিধের জন্য এখানে থানা করা হয়েছে। একটা জীপ পর্যন্ত নেই ও সি-র। মোটর সাইকেলও নেই। সাইকেল নিয়েই ঘোরাঘুরি করি। তেমন বিশেষ দরকার হলে কারো মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে যাই। একজনের মোটর সাইকেল আছে এখানে। উড-বি এম-এল-এ তিনি। তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়।

ময়না তদন্তের পর সুরাইয়ের লাশ কি গ্রামে নিয়ে যাবে সুরাইয়ের ভাই?

রাজু জিজ্ঞেস করল।

কি করে? লাশ-কাটা ঘরে ময়না তদন্ত শেষ হতে হতে তো কাল বিকেল হয়ে যাবে। লাশ বয়ে নিয়ে গরুরগাড়ি পৌঁছবেই হয়ত আজ রাতে। কম পথ তো নয়। ডাক্তার থাকবেন কিনা তারও ঠিক নেই। কালকে রবিবার। হয়ত শ্বশুরবাড়ি যাবেন রাউরকেল্লাতে। তাহলে তো পরশু হয়ে যাবে। তাছাড়া, কাটা-ছেঁড়া, ফোলা-ফাঁপা দুর্গন্ধ লাশ যখন ফেরত পাবে ও, তখন আর জুরুয়াতে নিয়ে আসার অবস্থা থাকবে না। ওখানেই কোন নদীর পাড়ে জ্বালিয়ে দেবে। তারপর ফিরে যাবে গ্রামে। গরিবের লাশ। ওরা কি আর ফুলের পাহাড় করে পয়সা ছিটিয়ে প্রোসেশান করে শ্মশানে যায়? জন্মায় ইঁদুরের মতো,

মরেও ইঁদুরের মতো।

দুজন কনস্টেবল রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল দুপাশে। এবার অভিযুক্ত সাতজন আসবে।

রাজু বলল, ওরা কিছু খেয়েছে সকাল থেকে?

কী আবার খাবে? বাড়িতে কি রোজ পোলাউ মাংস খায়, না শ্বশুরবাড়ি এসেছে! সকালে পোকাল তো নিশ্চয়ই খেয়েছিল। তারপর হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়া খেয়ে নিজেদের বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে তবে না ভাইকে মেরেছে। রাগে মাথায় মারে, তাও বোঝা যায়। এ তো ডেলিবারেট, প্ল্যানড মার্ডার।

থানায় ওদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি?

হবে হবে। তা নিয়ে আপনাদের চিন্তা নেই।

রাজু বলল, আমি গিয়ে ওদের দেখতে পারি একটু। কখনও মার্ডার দেখিনি। মার্ডারারও না। কেমনভাবে থাকে ওরা থানাতে একটু দেখতাম!

চাঁদবাবু হাসলেন।

বললেন, দেখবেন তো। এখানেই আসছে ওরা। তারপর অ্যাপোলজিটিক্যালী বললেন, এখানে তো হাজত নেই। একটা ছোট্ট ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় সাতজন সকাল থেকে আছে, হেগে-মুতে একসা করে রেখেছে—দুর্গন্ধে কাছে যেতে পারবেন না। বমিও করেছে দুজনে। রক্ত দেখে বমি করেছে। শালাদের ন্যাকামি দেখে গা জ্বলে। খুনই বা করা কেন? আবার যাকে খুন করলি, তার রক্ত দেখে বমিই বা করা কেন? সুরা তো খালি বলছে, এ আমরা কী করলাম! নিজের ভাইকে এমন করে কুপিয়ে কাটলাম! পাগলের মতো করছে ওরা।

বলতে বলতেই ওরা সাতজন এসে লাইন করে দাঁড়াল।

রাজু ভেবেছিল, মার্ডারার মানে, ভীষণ-দর্শন গোঁফওয়ালা লাল লাল চোখের কতগুলো ডাকাতকে দেখবে। কিন্তু তাদের সামনে যারা এসে খালি গায়ে ছিটের আণ্ডারওয়ার পরা অবস্থায় দাঁড়াল, তাদের

হাড়-জিরজিরে চেহারা, পেট ঢুকে গেছে পিঠের মধ্যে—চোখেমুখে উদভ্রান্ত, দিশেহারা ভাব।

মন্নু ওদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা খুন করলে কেন ভাই সুরাইকে ? সুরাই তো তোমাদেরই······

সুরা, যে প্রধান আসামী ; সে দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

মনে হলো, এই মুখ ওর কাউকে আর দেখানোর ইচ্ছা নেই। সে সবচেয়ে আগে এসে ধরা দিয়েছিল। খুনের খবরও তো দারোগা ওর কাছেই প্রথম পান।

অন্য একজন বলল, আমরা নই, আমরা নই হাঁড়িয়ার নেশা······ আর অন্য একজন······আমরা কী করলাম আমরা জানি না।

মন্নু সোজা হয়ে বসে দারোগাকে বলল, মনে হচ্ছে, ওরা কিছু বলতে চাইছে, যেন বলতে চাইছে ; ওদের দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে —ওদের উত্তেজিত করেছিল অন্য কেউ ·····

সার্কল ইন্সপেক্টর মুখ নামিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ বললেন, ওদের ভিতরে নিয়ে যাও। যত্ত সব উল্টোপাল্টা কথা ! নিজে হাতে খুন করে এসে এখন······

রাজু বলল, আপনাদের কি উচিত নয়, যে-লোকের হাত এই মার্ডারের পেছনে আছে, তাকে সামনে আনা। মার্ডার অ্যাবেট করাও তো মার্ডারের মতোই অপরাধ !

চাঁদবাবু হাসলেন, বললেন, চা খান। এখানের দুধ খুব ভালো। চা দারুণ হয়। আপনি দেখছি, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডও জানেন।

রাজু আবার বলল, আমি কিছু টাকা দিতে পারি ওদের ? একটু চা-টা খাওয়ানোর জন্যে ?

সার্কল ইন্সপেক্টরের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বললেন, না। পারেন না। আইন নেই। আপনারা বড় শহরের লোক। গরিবদের জন্যে আপনাদের খুবই দরদ। থ্যাঙ্ক উ্য। ইটস্ ভেরী কাইণ্ড অফ উ্য।

এবার আমরা উঠি। বাংলোয় গিয়ে চান-টান করি।

হঠাৎই উঠে পড়ে চাঁদবাবু বললেন, হ্যাঁ ! এবার আপনারা আসুন। আমাদের রিপোর্ট টিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আপনাদের সারাদিনটা নষ্টই হলো বলতে গেলে।

রাজু উঁকি মেরে দেখল, টেবলের উপর খোলা আছে কেস ডায়রীর খাতা।

Schedule XL VII—form no. 120 Pm form no. 8

CASE DIARY

(Rule 104) **32**

Police Station·············· ···District··················

First Information Report no·············of 19·········

Case diary no······· · ··· Sec·············no······ ·· · ···

Date and Place of occurance·························

········ ···························· ··············· ··················

Date (with hour) on which action was taken and place visited. Record of Investigation

রাজু জানে যে, ওরা চলে গেলেই কেস-ডায়রীর খাতা ভরে উঠবে অনেক ইংরিজী শব্দে। তাতে লেখা হবে, সাতজন সাংঘাতিক চরিত্রের খুনী এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে, সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সজ্ঞানে এবং ঠাণ্ডা মাথায় সুরাই নামক একজন লোককে ধানকাটা এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধে নৃশংসভাবে খুন করেছে। অতএব, এই সাংঘাতিক ও বিপজ্জনক অভিযুক্তদের যেন কিছুতেই জামিনে খালাস না করা হয়। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ওদের যেন পুলিশের হেপাজতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে অন্তত তিন মাস রাখা হয় দায়রায় সোপর্দর আগে, ইত্যাদি······

এমন সময় লাল ধুলো উড়িয়ে ভটর ভটর শব্দ করে একটা লাল রঙের মোটর সাইকেল এসে থামল থানার সামনে। মুখে বসন্তের দাগ, অতি কুৎসিৎ একজন কুচকুচে কালো মোষের মতো লোক

ধবধবে ধুতি আর শার্ট পরে মোটর সাইকেলের চাবি হাতে করে এলেন।

চাঁদবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনিই সেই উড্-বি এম-এল-এ। যাঁর কথা বলছিলাম।

উড্-বি এম এল-এ বললেন, খবর সব শুনেই এলাম। জুরুয়ার মুরুব্বী তো ভারী বুদ্ধিমান। এখন বিনা পয়সায় খুনী আর অভিযুক্তদের সকলের মেয়ে-বৌ-মাকে দিয়ে নিজের ক্ষেতে কয়েক বছর কাজ করিয়ে নেবে—প্রায় নিখরচায়। একবেলা পোকাল দেবে হয়তো খেতে। আর মেয়ে-বৌদের মধ্যে যারা ডাগর, তাদের মধ্যে পছন্দসই কাউকে কাউকে নিয়ে শোবেও। বেড়ে আছে তোমাদের জুরুয়ার বাঘ।

এতখানি বলে যাবার পরই, রাজু আর মন্নুর দিকে চোখ পড়াতে থেমে গিয়ে বললেন, এঁদের পরিচয় তো পেলাম না!

এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে গেছিলেন জুরুয়াতে।

উড-বি এম-এল-এ বললেন, অ!

তারপর বললেন, খবর পেলাম যে, জুরুয়ার মাতব্বর ওদের জামিনের জন্যে চেষ্টা করার জন্যে কালই যাবে সদরে।

সার্কল ইন্সপেক্টর বললেন, এই কেসে কখনও জামিন হয়? মেইন মার্ডারাররা নিজেরা সারেণ্ডার করেছে এসে। কনফেস্ করেছে। প্রত্যেকেরই ফাঁসি, না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে। এই কেসে, বেল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আপনি কীসের পুলিশ-অফিসার মশাই! এ কথা কি সেই মাতব্বর নিজেও জানেন না?

ধমক দিয়ে বললেন উড্-বি এম. এল. এ।

তারপর বললেন, জামিন করাবার চেষ্টা একটা চাল মাত্র। ঐ লোকগুলোর বৌ-মা-মেয়েদের যতটুকু সামান্য জমি আছে তাও জলের দামে নিজের কাছে বিক্রী করিয়ে, দুধেল গাই, জবরদস্ত ষাঁড় সব-কিছু হাত-বদল করে নিয়ে সেই টাকা নিয়ে মাতব্বর জামিনের নাম

করে শহরে যাবে। মদ খাবে, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবে। তারপর ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বলবে যে, অনেকই চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুই করা গেল না।

ইস্‌স্‌..... বলে উঠল রাজু অনবধানে।

চাঁদসাহেব বললেন, আপনারা উঠবেন না? এরপর চান করলে জ্বর ধরবে যে! ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ।

হঠাৎই মন্নুর খালিগায়ে ছিটের আণ্ডারওয়ার-পরা লোকগুলোর কথা মনে হলো। খোলা গাড়িতে করে পাহাড় জঙ্গলের হাওয়ার মধ্যে ওরা আজ রাতেই যাবে অনেক মাইল দূরে সদরের থানায়।

ওরা এবার উঠল। কারণ, ওরা আরও বেশীক্ষণ থাকলে সকলের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হবে।

রাজু ও মন্নু নমস্কার করে বাংলোর দিকে চলল।

রাজু শুধোল মন্নুকে, এই উ৬্ বি এম এল এ কোন পার্টির?

কে জানে? ছাড় তো ওদের কথা।

বিরক্তিভরা গলায় বলল রাজু।

অনেকটা গিয়ে রাজু বলল, মন্নু, ছেলেবেলায় 'আংকল টমস্ কেবিন' পড়েছিলি?

হুঁ।

তাহলে পড়েছিলি!

হুঁ।

ওরা কেউ আর কোনো কথা বলল না।

প্রায়ান্ধকার পথে হাঁটতে লাগল।

॥ ৫ ॥

দুজনেরই চান হয়ে গেছিল। বারান্দায় বসেছিল ওরা। চাঁদটা উঠছে, তবে এখনও পরিষ্কার হয়নি আলো। তিনদিকের কাছিমপেঠা

ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলোকে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোরাস বলে মনে হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক?

হ্যাঁ। সম্পূর্ণই প্রাগৈতিহাসিক!

এই আসল, গ্রামীন; গরিব ভারতবর্ষ এখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগেই রয়ে গেছে। আমেরিকার তুলোর চাষের কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের মতো, বাংলার নীলকুঠির অত্যাচারিত চাষীদেরই মতো, যারা ভারতবর্ষের নিরানব্বই ভাগ, যারা জাতের মেরুদণ্ড, গ্রাম পাহাড় জঙ্গলের এই সরল, সিধা-সাদা, বড় ভালো, রক্ষকহীন মানুষগুলোর জীবনে ইতিহাস থেমেই আছে। কে জানে? আরও কতদিন থেমে থাকবে?

চাঁদের আলো আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে মনু বলল, রাম্ কিন্তু আছে। একটু খাবি নাকি?

ভুসস···স কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

চৌকিদার এসে বলল, চেকপোস্টের পাশের হোটেলে ডিমের ঝোল আর ভাতের অর্ডার করে এসেছে ও।

ভাত? মনু অস্ফুটে বলল।

ভাত কথাটা উচ্চারণ করতে, কানে শুনতেও কেমন অপরাধী অপরাধী মনে হলো।

হ্যাঁ বাবু। এখানের ভাত খেতে কোথা-কোথা থেকে লোকে আসে। এখানের ধান যে বড় মিষ্টি!

আমি ভাত খাবো না। কিছুই খাবো না। ক্ষিদে নেই।

তারপর রাজুকে বলল, তুই? তুই খা! আমার সঙ্গে তোর কি?

নাঃ। আমিও খাবো না।

ভাত না খাস, তো অন্য কিছু খা তুই।

চৌকিদার অবাক হলো। বলল, তাহলে কী খাবেন?

আমরা কিছুই খাবো না। ওরা দুজনেই সমস্বরে বলল।

আমাদের জন্যে একটু চা নিয়ে এস তো। একেবারে গরম।

তাহলে কী হবে? খাওয়ার যে অর্ডার করে দিয়েছি। পয়সা নেবে যে! চৌকিদার বলল।

তা হোক। পয়সা না হয় দিয়ে দেব আমরা। তুমি খেয়ে নিও।

তাহলে তাড়াতাড়ি যাই বাবু। এখুনি হাতী নামবে। ধান পাকার সময় এখন—হাতীরাও এই মিষ্টি ধানের খোঁজ রাখে। কত দূর দূর পাহাড় থেকে আসে ওরা। পানিপাঁই রেঞ্জ, গুরংগিরির ঘাটি থেকে। শুনছেন না? হুঃ হাঃ হুঃ হাঃ আরম্ভ হয়ে গেছে চারিদিকে।

হুঃ হাঃ টা কী ব্যাপার?

রাজু শুধোল।

হাতী তাড়ানোর জন্যে ক্ষেতে ক্ষেতে চাষীরা শব্দ করছে, মাচানে বসে।

হুঃ হাঃ, হুঃ হাঃ করলেই হাতীরা কি চলে যায় ধান না-খেয়ে?

বুড়ো চৌকিদার ফোকলা দাঁতে হাসল।

বলল, হাতী কি যায়? এক একটা হাতীর পেটে কত ধরে জানেন? এক একটা ধানের গোলা পুরো একা খেয়েও সাধ মেটে না যেন ওদের। হাতী শুধু খায়ই না, হাতী খায়, তছনছ করে, মাচান ভেঙে ফেলে। কখনও সখনও বিরক্ত হলে, ওদের স্বার্থে লাগলে, লোকও মেরে ফেলে। হুঃ-হাঃ করা ক্ষেত-জাগানীদের কাজ, তাইই করে। হাতীর কাজ ধান খাওয়া, হাতী ধান খায়; খেয়েই যায়, হাতীদের কোনো লাজ-লজ্জা ভয়-ডর কিছুই নেই বাবু।

বাজু অন্যমনস্ক গলায় বলল, তাইই...

তারপর বলল, তাহলে তুমি যাও, দেরি কোরো না আর...

চাঁদের আলোয় পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়তলী, উপত্যকা এবং যা-কিছু দৃশ্যমান সবই কানায় কানায় জোয়ারের জলের মতো ভরে উঠছে আস্তে আস্তে। চারদিক কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে আছে বলে বিশ্বাসই হচ্ছে না রাজুর।

চারদিক থেকে হঠাৎ হুঃ হাঃ, হুঃ হাঃ, হুঃ হাঃ শব্দে থমথমে নির্জন পাহাড়ী পরিবেশ চমকে ওঠে। ক্রমশ জোর হতে লাগল শব্দগুলো। একটা একটা টি-টি পাখি একা একা চমকে চমকে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

রাজু জিজ্ঞেস করল, কী পাখি রে ওটা? কী অদ্ভুত ডাক!

মনু বলল, ঢেনকানলের জঙ্গলে দেখেছিলাম ছেলেবেলায়। ওদের নাম, ডিড উ্য ডু ইট।

কী বললি?

বলেই, রাজু সোজা হয়ে উঠে বসল।

বললামই তো। ডিড উ্য ডু ইট্।

মনু কেটে কেটে নামটা উচ্চারণ করতে চাইল, অথচ কেবলই জিভটা জড়িয়ে আসতে লাগল।

রাজুর মস্তিষ্কের কোষে কোষে একলা, ভীত, চকিত পাখির ডাকটা ক্রমশই জোর হতে থাকল। জোর হতে হতে ওর মাথার মধ্যে স্টিরিওফোনিক শব্দের মতো বাজতে লাগল। কে যেন একটা দ্রুতগতি শব্দের মারাত্মক সাপকে তার মস্তিষ্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে হলো ওর—শব্দটাকে থামাতে চাইল, ধামাচাপা দিতে চাইল, গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইল রাজু; কিন্তু শব্দটা, শব্দটা…

পাখিটা ডাকতে ডাকতে ওদের একেবারে সামনে, বাংলোর হাতার উপর চলে এসে ক্রমাগতই ঘুরতে লাগল। লম্বা লম্বা পা-দুটো বিচ্ছিরীভাবে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে থাকল তার শরীরের নীচে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পাখিটা, মনুকে, রাজুকে এবং যেন এই বিরাট দেশের সমস্ত শিক্ষিত, সুখী, আত্মবিস্মৃত, কাপুরুষ ঘুমন্ত মানুষদের বুকের মধ্যে একটা দারুণ শীতার্ত, গা-ছমছম সুরার রক্তে-ভেজা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে লাগল বারবার তপ্ত তীরের মতো, …

।৯।

দুর্গাপুরের-ডি-ভি-সি বারাজ জল ছেড়েছে জোর আজ সকাল থেকে। কাল বিকেলে লাল ফ্ল্যাগ তুলে দিয়েছিল উয়্যার-এর উপরে। তোড়ে নেমেছে, লাল ঘোলা জল দামোদরের বুক বেয়ে। দ্বিজপদ ও কেদার নীলরঙা নাইলনের বাঁধ-জালটা চরের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে শুকুবার জন্যে। আজ বুঝি আর জাল ফেলা যাবে না। রোজগারপাতি হবে না কিছুই।

অ্যানিকাটের সামনে একটা চোরা ঘূর্ণী আছে। গত বছর ওপারের বেলোমা গাঁ থেকে দুটো ছেলে ধান নিয়ে আসছিল চাক-তেঁতুলের ধানভাঙা কলে ভাঙবে বলে। হঠাৎ এই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে নৌকোসুদ্ধ তলিয়ে যায়। তারপর থেকেই ঐ জায়গাটা বাঁচিয়ে চলে জেলেরা।

গামছা-পরা উদলা-গায়ের-ছোড়াগুলো পোলো আর খেপলা জাল নিয়ে অ্যানিকাটের ঠিক নীচে যেখানে কংক্রীটের বেঁটে বেঁটে থামগুলো আছে জলের তোড় রোখার জন্য, সেখানে অন্যান্য দিন ঝাপাঝাঁপি করে বেড়ায়। কখনও সোনাট্যাংরা, চিংড়ি বা বাটা পেলেও পায়। কিন্তু আজ নদীর চেহারা দেখে তারাও আর এমুখো হয়নি ; রোণ্ডিয়ার মোরাম-ঢালা পথে মেহগিনী গাছগুলোর নীচে দল বেঁধে ডাংগুলী খেলছে।

পরেশ গুপ্তর দেশ ছিলো উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে। গোলাপ-জলের নামী জায়গা। হলে কী হয়, গত তিরিশ বছর সে পশ্চিমবঙ্গে এই পানাগড়-বর্ধমান রোণ্ডিয়ার আশেপাশেই। খড়ে-ছাওড়া ঘর বানিয়েছে একটা ক্যানালের বাঁধের পাশে। চা-সিগারেট বিক্রি করে। মাছ কেনে, জেলেদের কাছ থেকে—কিছু লাভ করে, ছেড়ে দেয় শহর থেকে গাড়ি-চড়ে আসা বাবুদের কাছে। ভাল দামেই বিকোয় মাছ। শহরের দামেই প্রায় বলতে গেলে। যেহেতু আড়, চিতল, কালবাউশ-

গুলো নড়াচড়া করে ; বাবুরা চেগে যান।

বলেন, টাটকা ত ! শহরে যে মাছ পাই, তা তো বরফচাপা।

আজকাল টাটকা মাছেও গন্ধ হয়। কোক্ ওভেনের জল মেশে দামোদরে। নদীর জলে গন্ধ ; মাছে গন্ধ। কত্ত সব কলকারখানা হয়ে গেছে নদীর উত্তরে। জলে হরজাই বিষ পড়ে। গরমের সময় বা শেষ শীতে, জল কমে গেলে, মাছ সব বিষে মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। বড় বড় রুপোলী চিতল—লেজে হলুদ-কালো বুটি দেওয়া। দেখলেও চোখে জল আসে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে নদীর বুক বেয়ে, ফুলে ওঠা মরা মাছগুলো তখন ভেসে যায় দক্ষিণের চরের শেয়ালদের খোরাক হয়ে। শালা শেয়ালদের খাটা-খাটনী নেই। দিব্যি আছে। মাছ খাচ্ছে, গান গাইছে ; বাচ্চা বিয়োচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। দোকানে খরিদ্দার নেই। একটু আগে রোশুিয়ার বাংলো থেকে মাছ কিনতে এসে মাছ না-পেয়ে এক বাবু কিছুক্ষণ বসেছিলেন। চা চেয়েছিলেন। সঙ্গে তুটো লেড়ো বিস্কুট। বলেছিলেন, ছেলেবেলায় লংকার গুঁড়ো-মাখা লাল লাল ঝাল লেড়ো পাওয়া যেত। এখন ছেলেবেলারই মত ছেলেবেলার সব ভালোলাগার জিনিসগুলোও হারিয়ে গেছে একেবারে।

পরেশ বলেছিল, সত্যি কথা। সব কিছু ভাল জিনিসই হারিয়ে গেছে তুনিয়া থেকে। তারপর দূরের টিপকলের জল এনে চা করে দিয়েছিল বাবুকে। নদীব জলেও গন্ধ। মরার কোক্-ওভেন এদের সকলকে মেরে তবে ছাড়বে।

চা খেয়ে, বাবু চারধারের ছিনিক-বিউটির তারিফ করে চলে গেছে।

পরেশের কালো-ভুটিয়া কুকুরী লক্ষ্মী খড়ের চালার বাইরে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল নদীর হাওয়ায়। ক'দিন থেকে রোদ নেই। মেঘ করে আছে সব সময়। কখনও বাড়ে, কখনও কমে বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে। বেশ হিমসিম ভাব। নদীর হুহু হাওয়ায় ঘুম আসে। লক্ষ্মী আরামে ঘুমোয় মেঘের ছাতার নীচে।

হঠাৎ ভুক্-ভুক্ করে ওঠে লক্ষ্মী। পরেশ চোখ তুলে তাকায়।

বিড়িটাতে শেষ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। সনাতন আসছে। সনাতন আঁকুড়া।

ছেলেটাকে এড়িয়ে চলতে চায় পরেশ, কিন্তু ভালোবাসার ভান করে।

সনাতন প্রায় ছ' ফিটের মতন লম্বা। কালবাউশের মত গায়ের রঙ। কিন্তু তাতে পানকৌড়ীর জেল্লা। চ্যাটালো বুক। বুকে কোনো ভাঁজ নেই। অথচ চওড়া বিরাট। কাঁধ থেকে মাথাকে তফাত করেছে একটা লম্বা গলা। শীতের নদীতে উড়ে-আসা বিদেশী হাঁসের গলার মত। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবি।

পার্টি করে সনাতন। এবারে এদিকে পঞ্চায়েত ইলেকশনে কমোনিস্টোরাই ছিট নিয়েছে সব্বচেয়ে বেশী।

পরেশ ভাবে, সনাতন ছেলে ভাল। রাগী একটু বটেক্—তবে সোজা। পরেশ ওকে ভয় পায়. কারণ পরেশ ব্যবসাদার। মুনাফা উঠিয়ে, ও খায়। যদিও ও ভোট দেয় বাবুদেরই। তাতে সনাতনের খুশী হওয়ারই কথা। পার্টি-করা ছোঁড়ারা অনেকেই নিজের নিজের ধান্দায় সকলকে চোখ রাঙিয়ে বেড়ায়। এর টুপি ওকে পরায়। কিন্তু সনাতন অন্যরকম। এরকম ছেলে যে দলই পাবে. সে দলের মান প্রতিপত্তি বাড়বে বলেই পরেশের বিশ্বাস।

এখন সনাতনও মাছের কেনা-বেচা করে একটু-আধটু। এর আগে ও পানাগড়ের মিলিটারী ক্যাম্পে একজন এম-ই-এস-এর ঠিকাদারের কাছে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। তখন পেতো, দিনে আট টাকা। ওখানে টিকে থাকলে, আরও বেশীই পেতো আজকে। সেই বাবু একদিন মাছ কিনতে এসে বলে গেলো, এখন মিস্ত্রীরা নাকি দিনে চোদ্দ টাকা পাচ্ছে।

সনাতনের লোভ নেই টাকার। পেট চললেই হল কোনোক্রমে। টাকা রোজগারের চেয়েও বড় কিছু করার আছে ওর। মা-বাপ হারানো, আত্মীয়-স্বজনহীন সনাতন অনেক কিছুই ভাবে। সব অন্য রকম ভাবনা।

সনাতন পরেশের দোকানে ঢুকল। ঢুকে, মাচায় বসল।

কেউ কোনো কথা বলল না। মাচা থেকে খাতাটা তুলে নিল সনাতন। খাতায় মাছের হিসেব দেখল। তারপর খাতাটা নামিয়ে রাখল।

পরেশ বলল, চা হবে নাকি?

সনাতন বলল, তুমি খাবে ত হোক।

আমি ত এই-ই খেনু।

তালে থাক্।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরে লক্ষ্মী খচ্ খচ্ করে নখ দিয়ে গা চুলকাচ্ছে, তার শব্দ কানে এল। মেছো-চিলের তীক্ষ্ণ স্বর জলের উপর দুবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল।

পরেশ বলল, পালা এগোল কদ্দুর?

সনাতন খুশী হল। হেসে ফেলল।

বলল, দূ—র্। সবে ভূমিকেটা হল। এখুনি কী। ঈ সব তাড়ার কাজ লয় গো।

ভূমিকে হল কেমন? পরেশ একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে শুধালো। যেন পালা-টালাতে পরেশের বড়ই উৎসাহ।

সনাতন বলল, ভূমিকার আর ভালোমন্দর কী? আসল পালাতে আসি আগে। অনেক সময় লাগবে। এমন পালা আগে লেখা হয় লাই। এ দেশে কেউ লেখে লাই।

পরেশ সনাতনকে খুশী করার জন্যে বলল, তা ত বটেই। পালা লেখা কী ইয়ার্কি-কথা। ত' তাড়াতাড়ি শেষ করলে এখানে সামনের পুজোয়, কি কাহেবা-মানার বেহুলা লখীন্দরের মেলায় মাঘ মাসে, নয় ত নিদেন চাক-তেঁতুলের গাজনের সময় পাবলিক্‌কে শুনিয়ে দেওয়া যাবেক্। তুমি তড়িঘড়ি লিখে ফেলো না—তারপর পালা যাতে হয় তা আমরা দেখবু।

সনাতন বলল, এ পালা শুধু এ গ্রামের জন্যেই লয় গো পরেশদাদা!

আগে ছাপাব এটাকে—তারপর গ্রামে গ্রামে সকলে করবে এ পালা। খেলা লয় এ। লতুন পালা। জনগণের পালা।

ছাপাবে ? বলে, পরেশ গুপ্ত নড়ে-চড়ে বসল।

তারপর বলল, ছাপাবার খরচ জোগাড় হবে কুত্থেকে ?

সনাতন হাসল। বলল, মাছের কেনা-বেচা করছি কেন তালে ?

পরেশ কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, তালে হবে।

কিন্তু কান চুলকোতে চুলকোতেই পরেশের সন্দেহ হল যে, সনাতন পালা লিখলেও, ছাপাবার টাকার জোগাড় করতে পারবে না।

আসলে সনাতন ত বেশী পড়াশুনা করেনি। বারাজের উপর যে পাথরের ফলকটা আছে ইংরিজীতে, সেই ফলকটাকে একদিন পরেশ পড়তে পেরেছিল। জোরে জোরে। "রোণ্ডীয়া উয়্যার। ওপেনড বাই স্যার জন অ্যাণ্ডারসন, গভর্নর অফ বেঙ্গল, সেকেণ্ড সেপ্টেম্বর, নাইনটিন্ থার্টি থ্রী।" পড়ে শুনিয়েছিল সনাতনকে।

সনাতন ইংরিজী জানে না, বাংলাও তথৈবচ। পরেশ জানে, ইংরিজী না জানলি, লা বিদ্দেন হওয়া যায় : লা লেতা।

পরেশ গাজীপুরের স্কুলে পড়েছিল ফাইভ-ক্লাস অবধি। আর সনাতন পড়াশুনা করেছিল গাঁয়ের পাঠশালে : সামান্যই।

সনাতন বলল, কে কত পড়া-লেখা করল সেইটাই বড় লয় গো পরেশদা বুঝলে ? কে মানুষ কেমন ? কার বলার কী আছে ? সেইটিই হতিছে আসল কথা। পড়াশুনা করেও মানুষ অমানুষ হয়।

পরেশ ও সনাতন অদ্ভুত বাংলা বলে। গাজীপুরী উর্দু মিশ্রিত হিন্দীর সঙ্গে রাঢ় বাংলার ভাষাকে আতপ চাল আর সোনামুগের ডালের খিচুড়ীর মত মিশিয়ে ফেলেছিল পরেশ।

সনাতনের ভাষাটাও বহু জায়গায় থাকতে থাকতে মিশ্র হয়ে গেছে।

পরেশ বলল, কথাটা ঠিকই বলছু তুমি। আসল হচ্ছে গিয়ে ভালোবাসা ; লভ্। যদি দিশকে তুমি ভালোবাসো, তবে সেই দিশের পালা তুমার দিশের দশের কাছে উত্তরোবেক্ই গো, উত্তরোবেক্।

ভিতরে মাল লাগে বুজুছো গো! বিচ্ছে ধুয়ে কী হয়?

সনাতন উত্তর দিলো না। চুপ করে বসে নদীর দিকে চেয়ে রইল। ওর বুকের মধ্যে রক্ত, বর্ষার দামোদরের জলের মত ছলাক্ ছলাক্ করে ঘুরপাক খেতে লাগল।

মনে মনে সনাতন বলল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক পরেশদা।

আজ যেহেতু কোনো জেলেই জাল ফেললো না, মাছের আশা নেই। মাছ না উঠলে পাইকার, খুচরো খরিদ্দার, ফোতোপুর, কাহেনা-মানা, ওপারের বেলোমা, দূর দূর গ্রামের কোনো জায়গা থেকেই লোক আসবে না মাছের খোঁজে। সুতরাং পরেশের দোকানে চা-সিগারেট যে আজ আর বিক্রী হবে সে আশা কম। ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। বলল, ঘর্কে যাবু। তু কুথাকে যাবি রে সনাতন?

সনাতন বলল, এই একটু ঘুরে-ঘারেই ফিরে যাবো।

ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। তালাটা লাগাল। তারপর রোণ্ডীয়ার দিকে পা চালাল। ওর কালো কুকুর, লক্ষ্মী; পিছন পিছন চলতে লাগল মোরামের উপর খচ্ খচ্ আওয়াজ তুলে। বাঁধের কাছে এসে যেখানে বড বড় কালো পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অশ্বত্থ আর সেগুনের চারা গজিয়ে উঠেছে সেখানটাতে একটু ভাল করে দেখে নিলো পরেশ।

ক্ষতি করে না কখনও সাপগুলো। কিন্তু গরম আর বর্ষার দিনে মাঝ-পথ জুড়ে শুয়ে থাকে। বড় বড় সাপ। চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, গোখরো। বানের জল যখন পাথরের ফাঁকে-ফোঁকে ঢুকে পড়ে তখন বেরিয়ে পড়ে উপরে। অন্ধকার নেমে এলেই নেমে যায় নদীতে। মাছ ধরে খায়।

সনাতন পরেশের ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। বাঁদিকে চলে গেছে কানালের পাশের বাঁধের পাড়ে পাড়ে মোরাম ঢালা পথটা বর্ধমানের দিকে। এপথে যায়নি কখনও সে বর্ধমানে। কানালের ওপাশে হৈ দূ—রে কেয়ারী-করা বাগান ঘেরা বাংলোটা। পানাগড়ের মিলিটারী সাহেবরা মাঝে-মাঝে পিক্‌নিকে

আসেন। মাথার উপর লাল আলো জ্বালিয়ে ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল সাহেবদের গাড়িগুলো ভীড় করে মাঝে মাঝে।

কানালের পাশেই বাউড়িদের খড়ের ঘরগুলো। ওরা থাকতো চাকৃতেঁতুলে। দু'বছর আগে বাউড়িপাড়ায় এক নাম-না-জানা পোকার উপদ্রবে মারা যায় অনেক লোক। সে পোকা চোখে দেখেনি কেউ। "কামড়াল, রে কামড়াল" ঃ বলতে বলতেই যাকে কামড়াল, সে মৃত্যুর গায়ে ঢলে পড়ে। ওরা তাই গাঁ ছেড়ে এসে কানালের ধারে নিজেদের ঘর বানিয়ে নিয়েছে। চাক্‌তেঁতুলে মা মনসা আর কালী মায়ের থান আছে। বাউড়িরা নাকি গরু কেটেছিল সেই থানে। এই দোষে মায়েরা পোকা পাঠিয়ে ওদের শাস্তি দেন।

নদী থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। সনাতনের ঘাড় সমান বড় বড চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সনাতন নদীর চরের দিকে এগোয়। ও বুঝতে পারে যে, আসলে ও কবি, লেখক। টাকাপয়সা, মাছ-পাইকার এমনকি পার্টিও বুঝি ওর আসল ঠাঁই লয়। ওর বুকের ভিতর অন্য একটা মানুষ বাস করে। জনগণের কত দুঃখু দুর্দশা—কত কষ্ট মানুষের—দেশে লতুল দিন আনতে হবে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে লতুল কথা শোনাতে হবে মানুষগুলোকে।

চরে নেমে এল সনাতন। বাঁয়ে পবনমাধুর পোড়ো অশ্রমটা। নিম, তেঁতুল, আমলকী বেলের ভীড় মধ্যিখানে। চারপাশে দু'মানুষ সমান করবীর বেড়া। পবন সাধু মরে গেছে। মায়ের মন্দির ছিল মাটির ; তাও পড়ে গেছে। তবু এখনও গাঁয়ের লোকে মায়ের থানের দিকে পা দেয় না,—অন্য দিক দিয়ে পবন সাধুর আশ্রমে ঢোকে।

এখন জমজমাট আশ্রম বেলোমাতে। নদী পাড়ে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সাধুরা এসে সিখানে আশ্রম বানিয়েছে। খেয়া পারাপার করে, মেয়েপুরুষে যায়। জেলেরাও ঘুরে আসে সময় পেলে।

সনাতন নিজেই নিজেকে বলে, আচ্ছা ভগমান নাকী লাই? পঞ্চায়েত ইলেকশানে একজন বড়-পার্টি-লিডার বক্তিমে দিতে এসে সনাতনকে বলেছিলেন কমোনিস্টোরা ভগবান মানে লা। মানুষই

হল গিয়ে ভগমান। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে লাই।

কিন্তু এই গাঁ-গঞ্জের লোকগুলান যে ভগমান ভগমান করে পাগল। এদের ভাল করে বুঝাতে হবেক। বুঝাতে হবেক যে, ভগমানে আর কমোনিস্টোদের মধ্যে কোনো বিরোধ লাই। এসব বুঝাবে সনাতন ওর পালাতে। পালার মত একটো পালা লিখবে সে বটেক।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লাল পাল তুলে বেলোমার দিকে খেয়া নৌকো সাবধানে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ-মেঘালীর খেলা। ঘোমটা পরা, ঘোমটা খোলা। খেয়া নৌকোয় হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁস-মুরগী, মাটির জালা নিয়ে বেলোমার মেয়ে-মরদরা হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে। আজ হাট ছিল।

সনাতনের এই হাটের কথায় মনে পড়ল কথাটা। এই হাটটা আগে ছিল রোণ্ডীয়াতে। কিছুদিন হল প্রতি হাটের দিন কতগুলো লোক এসে মদ খেয়ে হামলা করত। কখনও মেয়েদের হালকা বেইজ্জতীও করত। ঝুটঝামেলা। এই গাঁ-গঞ্জের মানুষগুলো বড়ই গাড্‌কেলাশ শান্তিপ্রিয়—। কোথায় ঝামেলাবাজদের টাইট করবে, তা লয়। ওখানে হাটই বসাবে না ঠিক করল সকলে মিলে। কী শান্তি, কী শান্তি। শেষে হাট গিয়ে বসল অন্য জায়গায়, যেখানে ধান-ভানা কল, আটা-ভাঙ্গা চাকী—একেবারে হাটের মধ্যিখানেই ওদের কল হল। রথ দেখা কলা-বেচা ফিট্। ফোর-পাইস রোজগার হল গিয়ে। আর সেদিন থেকে হামলা-করা মানুষগুলোও কুথায় জানি মেজিকের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই সকলই বড়লোকদিগের চক্রান্ত।

হঠাৎ একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। ভিজে ঘুঘু বড় কড়া করুণ ডাকে। চারধারে বালি, বালিয়াড়ি সোঁতা। শরবন আর কাশিয়া, নরম কালচে সবুজ—কী টান টান—বৃষ্টিভেজা ঘুঘুর ডাক হঠাৎ সনাতনের বুকের মধ্যে যেন ছুরি বসিয়ে দিল একটা—হ্যাণ্ডেল অবদি।

হঠাৎ, হঠাৎই সোনামণির কথা মনে পড়ে গেল সনাতনের।

চাকৃতেঁতুলের সোনামণি। বড় মন্দ-মধুর মেয়ে সে। আজই না সকালে দেখা হল হাটে! হলোই ত মানিক! একবার দেখায় কী ভরে মন? না কী মন ভরার? গাছ কোমর করে শাড়ি পরে হাটের মাঝে তার ভাইয়ের পাশে মাটিতে বসেছিল বুকের কাছে পা তুটো গুটিয়ে নিয়ে তু হাত দিয়ে তু পা জড়িয়ে। আশপাশ সার সার নিমগাছ, আঁশফল গাছ, তালের সারি। একপাশে পুকুর। মধ্যে সোনামণি। কত লোকজন হই-হই, শাক সবজি, বেলোয়াড়ি চুড়ি, রিবন ফিতে, তরল আলতা, সোহাগী সিঁতুর, তার মাঝে সনাতনের সোনামণি!

হাটে কতরকম গন্ধ। গুড়ের গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, চালের গন্ধ, হাঁস মুরগীর গন্ধ, মানুষের ঘামের, গন্ধ—কালো কালো চকচকে সব মানুষ যারা শরীর খাটিয়ে খায় রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে; যারা সনাতনের আসল বাঙলাদেশ তাদের সকলের সব গন্ধ মিলে নেশা ধরিয়ে দেয় সনাতনকে। তার মধ্যে সোনামণি।

সনাতন চরের মধ্যে কাশিয়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাওয়ায় মুখ রেখে বলে, সোনামণি রে, সোনামণি, তোর বুকের খাঁজে কেমন গন্ধ রে মেয়ে!

তারপর হাত নেড়ে বলে, একদিন তুই আমার হবি, হবি; হবিই। সেদিন তোর সব গন্ধ নিবো তু নাক ভরে। তোকে এমন আদর করব না, তুই দেখিস তখন। তুই আমার বউ। তুই দেখিস, তোর সঙ্গে ঐ বড়লোক লিমাই-এর বিয়ে হবেক লাই। আমি পালাকার, একদিন আমি পার্টির লিডার হবু। আমার কথা মানবে, শুনবে দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক—সেদিন তোর বুকটাক্ হাতে নিয়ে পিথিবীটাকে আমি আমার হাতে লিব, হাঁ! দেখিস্ তুই।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা বহুদিন থেকে এসে চরে খড়ের ঘর করে রয়েছে। পাট লাগিয়েছে ওরা। তরমুজ করে, খেরো বোনে। চরে যা যা হয়, সব। জল খুব বাড়লে কখনও কখনও আগে থাকতে বাড়ি ঘর তুলে নিয়ে বাঁধে গিয়ে থাকে দিনকয়। আবার জল নামলেই নেমে আসে।

ডানদিকে নদীটা চলে গেছে। ধু-ধু বালির চর। সোনামণির অদেখা উরুর রঙ বোধহয় এই সোনালী বালির মতই হবে। ভাবে সনাতন। একমুঠো বালি তুলে নিয়ে গালে ঘষে। মুখে ঢুকে যায় কিছু। বলে থুঃ থুঃ।

তারপরই বলে, তোকে বলিনি কখনও সোনামণি। তুই আমার সোনামণি। তারপর নিজের মনেই বলে, ভালোবাসায় বড় দুঃখু রে। তার কথা নদী শোনে, হাওয়া শোনে।

নদীটা কোথায় গেছে? এই চরের মধ্যে হু-হু হাওয়ায় দাঁড়িয়ে একথা প্রায়ই ভাবে সনাতন। শুনেছে, ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু কোথায়? কত দূরে! দুজনে কী মিলে এক হয়ে গেছে। দামোদর ত' নদ, আর ভাগীরথী নদী। নদ আর নদী মিলনে কী এক হয়ে যায়?

মনে মনে জিগেস করে সনাতন, কীরে সোনা? জানিস তুই? নদ-নদীর মিলন?

কতদিন ইচ্ছে করেছে একটা ডিঙ্গি নৌকো নে দাঁড় বেয়ে একা একা চলে যায় দক্ষিণে।—নদী যতদূর যায়—ততদূর। দুপাশের চর, গ্রাম, গাছ-গাছালি, দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে। সনাতনের যে পালা লিখতে হবে! দেশের জন্যে, গরীবদের জন্যে পালা। পালাকারের কী মিথ্যে সাজিয়ে চলে? তার পেত্যেক কথাটি সত্যি হওয়া চাই, তার কাছের মেয়ে-পুরুষের মনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তাদের বুঝে, তাদের সঙ্গে কেঁদে, হেসে, মার খেয়ে অপমান সয়ে, তবেই না তাদের বাঁচার পথের হদিস্ দিবে সনাতন!

সনাতন ভাবে, ও লিখবেই। এদেশে এমন পালা আর কেউ লেখেনি কখনও। বুর্জো বাবুদের প্রেম-ভালেবাসা জয়-পরাজয় নিয়ে নয়—জনগণের পালা লিখবে সনাতন আঁকুড়া একটো।

এবার চর ভেঙ্গে বাঁধের পাশের পথে উঠে এল সনাতন। এদিকে অনেক লাল ভ্যারেণ্ডার গাছ। কী সুন্দর লাগে ছোট ছোট গাছগুলোকে। পাতাবাহারের মত। কী চিকন উজ্জ্বল লাল আর কালো আর ফলসা-রঙা পাতাগুলো।

সোনামণির বুকের রঙ ফল্‌সা। একদিন হাটে সনাতন দেখেছিল: সোনামণি বসে হাঁসের ডিম বিক্রী করছিল—সনাতন দাঁড়িয়ে দর করতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছিল হলুদ ছিটের ঢিলে ব্লাউজের ফাঁকে।

সনাতন একটা লাল ভ্যারেণ্ডার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চোখে বুলাল। বাঁধে উঠে এল সনাতন। ওপাশে বাউড়িদের বস্তি। ছোট ছোট স্বপ্নের মত খড়ের ঘরগুলো। কানালপারে একটাই সাঁই-বাবলা গাছ। তার পাশে খালি গায়ে, লাল শাড়ি পেঁচিয়ে কুনই উঁচিয়ে, টেনে টেনে, কালো সাপের মত চুল আঁচড়াচ্ছে বাউড়ি বউ কাঠের কাঁকই দিয়ে শেষ বিকেলে।

থম্‌কে গেল কবি সনাতন।

সামনে দামোদরের বর্ষার লাল ঘোলা জল বয়ে চলেছে কানাল দিয়ে। তার পাশে বাঁধ। বেওয়ারিশ বেসামাল বাতাসে বারিষ-ভেজা মেছো-বকের ডানায় বাস। চারপাশে চুপচাপ চাপচাপ ফিকে সবুজ। বাউড়ি মেয়ের কোমর সমান চুল উড়ছে হাওয়ায়। উড়ছে সাঁইবাবলার পাতা। কালো মেয়ের লাল শাড়ির আঁচল উড়ছে পত্‌পত্‌ করে।

চমকে গেল সনাতন। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে সেই দুঃখী, দিন-কামিন বাউড়ি মেয়ের চুল-এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্ত ভঙ্গীটা আর হাওয়ায়-ওড়া তার উদ্ধত গর্বিত লাল আঁচল সনাতনকে যেন কোন্‌ অনাগত দিনের স্পষ্ট আভাস দিল।

সনাতন নিরুচ্চারে বলল, বোন, আর কিছুদিন কষ্ট করো তুমরা—তারপর দেখো। আমরা সবাই বড়লোক হব। ভাল খাব, ভাল থাকব; ভাল পরব। বাউড়ি বোন: তুমি দেখো। নতুন পালা লিখছি আমি। আমার নাম সনাতন। শুনে লাও গো তোমরা সকলে সনাতন আঁকুড়া আমার নাম।

এখন রাত গভীর। একবার চাঁদ বেরুলো। বেরিয়েই ডুবে গেল পাতলা মেঘের আড়ালে। বড় জোরে জল চলেছে আজ বিকেল থেকেই। সনাতন ছেলেবেলা থেকে এমনটি দেখেনি। দূরে দামোদরের জল, চর ; কাশিয়া আর শরবনের ভীড় এখন আর আলাদাই করা যাচ্ছে না। মেঘের পর্দা ভেদ করে ফিকে একটা রুপোলী অস্পষ্ট আভা রোণ্ডীয়ার রাতের প্রকৃতিকে মুড়ে রেখেছে। সমুদ্রের ঢেউ এর মত অ্যানিকাটের জলের আওয়াজ ঘুমন্ত গ্রামের খড়ের ঘরগুলোতে হামলে পড়ছে।

সনাতন তক্তপোশের উপর সোজা হয়ে বসল। লণ্ঠনটা সামনে করে। তারপর খাতাটা আর একবার বের করল। বের করেই পাতা উলটাল।

জনগণের পালা

লেখক : শ্রীযুক্ত সনাতন তাঁকুড়া

ভূমিকা

যে দেশে গরিব চিরজিবন অত্যাচারীত, মান্নুষ মান্নুষের সম্যান পেল না সে দেশেরই কবী আমি। বড়লোকেরা গরিবকে কাজে বেবহ্যার করার পর যে দেশে লাথ্ মারে যে দেশে ট্যাকা আর বিদ্দার মুল্ল এক, সেই দেশেরই আমি পালাকার।

লা, লা হে গ্রামবাসি, এপালা গাজনের মেলাব ওরে লয়, লয় এ লখীন্দর-বেহুলার উত্সবেব জন্নেও।

এ পালা লিরবধী-কালের পালা।

সনাতন আঁকুড়া চীরদিন বাঁচবে না হয়ত, হয়ত সে লিচিহ্নই হবে টাকাওয়ালা মানুষের চক্কান্তে কোনোদিন. কিন্তুক শত শত সনাতন জলম লিবে এই লদিতিরে. এই রোণ্ডীয়ায়।

সনাতন চীরদিন থাকবে না। লাই বা থাকল সে। তার পালা, তার গান, গাঁয়ে গাঁয়ে, রোণ্ডীয়ায়, চাক্তেঁতুলে, ফোতোপুরে, কাহেবা-মানায় আর বেলোমায়ও সকলেরই মুখে মুখে ঘুরবে লিশ্চয়। আকাশ-প্রদীপ দিবে মা-বোনেরা সনাতন আঁকুড়ার লামে—সেদিল এক সনাতন-এর ঠেঙ্গে হাজার সনাতন জলম লিবে। জলম লিবে লিরবধী।

এইই প্রার্থনা কর্য়ে লিবেদক জনগণ-সেবক

সনাতন আঁকুড়া।

—ইতি উনত্রিশে ভাদ্র, তেরোশ পঁচাশী সন,

মোকাম, রোণ্ডীয়া, জিলা বর্দ্ধমান

ভূমিকার ওজস্বী ভাষাতে সনাতন নিজে পরম প্রীত হল। যে-

কোনো ভাল কাজ করার পর, তা সমাপ্তির পর—যেমন যে, তা করে তার বড়ই ভাল লাগে, সনাতনেরও তেমনই ভাল লাগল। অনেকক্ষণ সনাতন খড়ের দেওয়ালকাটা জানালা দিয়ে বাইরে দূরের প্রায়ান্ধকার নদীর দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথাই মনে এল সনাতনের। উদাস হয়ে গেল।

আজই সকালে লদীর চরে কেদার আর দ্বিজপদদের মাছ ধরার লীল রাঙা লাইলনের জালটা শুকোতে দেওয়া ছিল, দেখেছে। জালটা বাধ-জাল। দাম নেছিল চার হাজার ন'শ টাকা। কিন্তু আগের সপ্তাহে ঐ জালটে দিয়ে এক বারেই আঠারশো টাকার মাছ ধরেছিল ওরা।

কেদাররা সমবায় করেছে একটা। এ শালার দেশে এত কামড়া-কামড়ি খেউ-খেই যে নিজেরা নিজেদের ভালটা বোঝে কই? তাই-ই যদি বুঝত তবে কী আর এমন হত!

লোকগুলো সব কুঁড়েও বড়। একবেলা পেলে, তাইই-ভাল, পেট মাদিয়ে খেয়ে লিয়ে লদীর হাওয়ায় গুঁড়িসুঁড়ি ঘুম লাগাবে। আর পচেষ্টা ছাড়া, মেহনত ছাড়া, কোনো দিশ কী বড হয়? চিনে কী হল? রাশিয়ায় কী হল? তারা কী এমলি এমলিই সব লায়েক হয়ে গেল নাকি? না-খাটলি কিছু হয়? কুঁড়ের জাতের খালি ঘুম আর যার যার মেয়েছেলের উপর হামলে পরে বাচ্চার ইনজেক্‌শান্ ঢুকোনো। শালারা যেন শুয়োর। মাল লাই. সম্মাল লাই, এক মুঠো ভাতের জন্যি লিজেরে বিকিয়ে দিয়ে দিব্যি পরমানন্দে পাঁকের মধ্যে, ময়লার মধ্যে বড়লোকগুলার পা-চেটে দিন গুজরাচ্ছে। এক মুঠো খেছে আর লিজ লিজ পরিবারকে গুঁতুচ্ছে। লিজেরা বড়লোক হবে যে, সেসব কোনো ধান্দাই লাই গো ইদের। ইদের হবেটা কী। এই ইদের জন্যেই ত পালাটা লেখা। যদি পরিবর্তন হয়: আসে।

দ্বিজপদরা সমবায়ের টাকা দিয়ে লাইলনের জাল, ফাৎনা এটা সেটা কেনে। ঐটেই আসল কথা। ক্যাপিটল। যার ক্যাপিটল লাই তার লাইলন-জালও লাই। আর এই ক্যাপিটল. যে-পরিশ্রমে বসে বসেই ডিম পাড়ে। সুদ, খাতির, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা। টাকা।

অনেক টাকার পর ক্ষমতা। ক্ষমতার পর আরও ক্ষমতা

হঠাৎ পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দে রাতের গাঁয়ের আকাশ ভরে ওঠে। পানাগড়ের পথের দিক থেকে আসে আওয়াজটা। সনাতন ভাবে যে, এত রাতে কি মণ্ডলদের ট্যারেক্‌টর চলছে? দিশা পায় না আওয়াজটা কিসের?

মণ্ডলরা বড়লোক। পাকা দালান, আটাকল, জাঁতাকল, পুকুর, ধান জমি আবার ট্যারেক্‌টর। ঘণ্টা প্রতি চল্লিশ টাকা ভাড়া খাটায়। এক সনের ভাড়ায় মেসিনটার পুরো দামই উঠিয়ে নেওয়ার মতলব লয় কী? সেই একই কথা—গোড়ার কথা—ক্যাপিটল। যার আছে সে রাজা; যার লাই সে ফকির। বেশীর ভাগ বড়লোকেরই ত ক্যাপিটল হল্‌ গরীব ঠকায়ে! ন্যায্য গুণে, লোক না-ঠকায়ে, কটা লোকে ক্যাপিটল বানায় হে?

এই ফণী মণ্ডলের, লাটসাহেব ছেলেটার সঙ্গে একদিন লেগে যাবে সনাতনের। যদিও ওর বিবেক ওকে বলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। বলে: মাথা গরম করলে লোকে সম্মাল করবেনা সনাতন। দেশের দশের কাজ করতি হলি অনেক অপমাল অসম্মাল সয়। সিটা তোমার লিজের অপমাল বলে ভাবছ কেন? সিটা জাতির অপমাল, গরীবের অপমাল। সেই অপমালের আগুনেই ত খাঁটি ওয়ার্কার জ্বলে পুড়ে সোনা হয়। খাঁটি সোনা। গিলটি লয় হে।

মাথা গরম করে না সনাতন, কিন্তু একদিন করে ফেলেছিল। হাটের মধ্যেই থাবড়া কষিয়েছিল সজনে গাছের তলায় ফণী মণ্ডলের একমাত্র ছেলের গালে।

সবজি বিক্রি করতে এসেছিল হালু দাস কাহেবা থেকে। ঢেড়স-এর দাম না কী বেশী বলেছিল, তাই সটান লাথি চালিয়ে দিল ক্যাপিটল, গরীবের পেটে। সনাতন চিতাবাগের মত পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে। জনতার পতিভূ সে। থাবড়ায় থাবড়ায় বাছার নরম তুলতুলে গাল দামোদরের জলের মত লাল করি ছাড়ল। তখন তার চোখমুখের ভাবখানা কী, যেন গিলে খায়। ওদের যতেক কর্মচারী—তারা

সনাতনেরই ভাই—বেরাদর চিনা-জানা। সব শালা ক্যাপিটলের চাকর-দালাল শালারা। তারাই কী না তেড়ে এসে ঘিরে ধরল সনাতনকে।

কিন্তুক বুড়ো ফণী মণ্ডল ? বিড়েল-তপস্বী, গলায় কণ্ঠী, রুখুসুখু চেহারা, যার একমাত্র ভগমান টাকা ; সে কী না এস্থে সকলের সামনে তার ছেলেকে হাঁকড়ে বকল। এ কী অল্যায়। লাথ্ মারো কেন বাপ তুমি ? তুমি কী দেশের রাজা হলে চাঁদ ? এ কী বেবহার ? মান্নুষকে মান্নুষ জ্ঞান লাই ?

তারপর সনাতনকে আদর করে গাল টিপে পিঠে নে হাত দে বলল ঃ যা রে সনাতন বাপ্, মাথা গরম করিস লা। তুইও ত' আমার ছেল্যিই রে !

সোনামণিও সেদিন হাটে ছিল। দূর থেকে সেও সনাতনের দিকে আর পাঁচটা গাঁয়ের চাষাভুষো দিনমজুরদের সঙ্গেই চেয়ে ছিল মুগ্ধ বিস্ময়ে ; সম্মানের চোখে !

সকলে বলেছিল, হ্যাঃ, সাহস রাখে বটেক ছোকরা। হাটের মাঝেক্ মণ্ডলের পোকে থাবড়া-কষানো চারটি কথা লা হে।

হাটের মালিক কিন্তু দৌড়ে এসে বিবেদ মিটিয়ে দেছিল। তারই হাটে কোনো ঝুটঝামেলা পছন্দ লয় তার। ঝামেলি হলে, হাট যদি আবার অন্যত্র চলে যায় ? সকলেরই চিন্তা স্বার্থ।—

সেই গোড়ার কথা। ক্যাপিটল।

শব্দটা আরো জোর হচ্ছে—পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দটা যেন গ্রামময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। দামোদরের জলের শব্দের সঙ্গে ঐ শব্দটা যেন পাকায়ে যাচ্ছে। একবার মনে হল যেন তার দরজার কাছেই।

সনাতন দরজা খুলে বাইরে এলো। আকাশ মেঘে ঢাকা। আলো লাই—আকাশে অন্ধকার। দুর্গাপুর থেকে কি আবারও জল ছাড়ল লাকি ওরা ? চর বুঝি পুরো ডুব্যে যায়। বিষ্টি খুব হতিছে উত্তুরে—খবর পেয়েছে ওরা। চরে আছে মহিম ভাই আর নেতাই

কমকার. আগে পেশাতি ছেল কম্মকার আর এখন চায করুছে খেরোর আর পাটের। শালার পেট কী জিনিস!

সনাতন ভাবল, ওদের একবার দেখে আসবে। লাল সিগন্যাল যদি না দেখে থাকে, ত' ছাগল-মুরগী বউ-মেয়ে লিয়ে সব যে রাতারাতি ভেসে যাবেক গো তারা।

হাতে লণ্ঠনটা নিয়ে নিল সনাতন। আঁধার রাত, এখন মা-মনসার পূজারীরা সব বেরুবে। সনাতন জানে, ওরা কিছু করবে না সনাতনকে। পতি-বছর কাহেবা-মানার বেহুলা-লখীন্দরের মেলায় গান বাঁধে সনাতন। সাপের ভয় করে না সে।

হুহু করি হাওয়া আসছিল নদী থিক্যে। লণ্ঠনের আলোটা কাঁপে খালি। বাঁধের উপর দিয়ে চলল সনাতন—বাঁধ থেকে চরে নামবে সেই লাল ভ্যারেণ্ডার জঙ্গলের মধ্যি দিয়ে, ভাব্‌রির পাশে, পাশে, পবন সাধুর আশ্রম পেরিয়ে নেতাই আর মহিমকে দেখতে।

ওমাঃ জল যে বাঁধের গায়ে গায়ে! ছল ছল করে, খল্‌খল্‌ করে লক্ষ লক্ষ সাপের মত যায়।

আবার শুনতে পেল সেই পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দটা।

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় হে! শব্দ কিসেল?

সনাতন দাঁড়িয়ে পড়ে চারধার দেখে। আবার যে কান-খোঁচায় শব্দটা, পুটুর—পুটুর পুটুর—। কোথাও কোনো আলো লাই, অল্য আওয়াজ লাই—। বাউড়ি পাড়ার মেয়ে-মরদ ঘুমে বেহুঁশ। দূ-রে চাকতেঁতুলেও আলো লাই। শুধু মেঘে ঢাকা আকাশ আর জলের গজ্জন। লদীর—কানালের। আর হাওয়ার শাসানি।

থমকে দাঁড়াল সনাতন। চর ডুবান দিচ্ছে। জলে ভর্‌্যে গেছে যে একেবারে!

সনাতন বুক ভর্‌্যে দম লিয়ে ডাকে: নেমাই! অ মহিম!

সাড়া লাই।

সনাতন জানে যে, এ বাঁধ ভাঙ্গা লদীর কম্মো লয়। সাহেবদিগের বাঁধ এ। সিমেণ্টে কাদা মেশাতনি তখল পাব্‌লিকের কাছে। ফাঁকি

দে, সারতে পারত না কেউ। এখন ত চুরি ; খালি চুরি। পুকুর চুরি।

হঠাৎ সনাতন আবিষ্কার করে, বাঁধের তলা থেকেও যেন মাটি সরি যাচ্ছে। সনাতন ভয় পায়। সনাতন পিছন ফিরে দৌড়ে যায়।

জীবনে এই প্রথম সনাতন ভয় পায়।

আবার শব্দটা ফিরে আসে—পুটুর পুটুর্ পুটুর্ পুটুর্। পবন সাধুর আশ্রমে কী দৈত্য-দানো এসে ভীড় জমালো ? জলের ভয়ে কিছু ভাবারও সময় লাই সনাতনের। এদিকে লদী, ওদিকে কানাল। ভেসে গেলে সনাতন মিলবে গিয়ে সেই ভাগীরথীতে। মিলন হবেক লদ, লদী আর পালাকারের।

প্রায় বাঁধটা পেরিয়ে এসেছে সনাতন। আবার ও শুনল, পুটুর্ পুটুর—এবার যেন কাছেই। লদীর শব্দে আর হাওয়ার গুমড়ানিতে কী শোনার জো আছে কিছু ?

আসানসোল থেকে আসা ভাড়া-করা লোক দুটো, বাঁধের পাশে ভাব্‌রি আর লাল ভ্যারেণ্ডার ঝোপের আড়ালে মোটর বাইকটাকে শুইয়ে রেখে ওঁৎ পেতে রইল।

সনাতন যখন একেবারে বাঁধের মুখে, তখন দুজনেই একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সনাতন বাধা দেওয়ার আগেই, একজন পেটে আর একজন বুকে রিভলবার দিয়ে গুলি করল সনাতনকে।

গুলির শব্দও জলের গুম্‌গুমানিতে মিলে গেল।

জানলো না কেউ। গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ করে নিরন্তর অসংখ্য রিভলবারের গুলির মতই নদীর শব্দ জলজ অন্ধকারে উৎসারিত হয়ে মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

সনাতন, মা রে ! বলে পড়ে গেল।

অস্ফুটে বলল, ভগমান।

লণ্ঠনটা উল্‌টে পড়ে, নিবে গেল।

তার মা মরেছিল সনাতনের বয়স একে। মানুষ তবু মরার সময় মাকেই ডাকে। ভগমানকেও। কমোনিস্টোরাও ডাকে।

সনাতনের টানটান শরীরটা লাল হয়ে গেল তাজা রক্তে—তার

.........ার বুকের রঙের মত ফল্‌সা-রঙা আর লালচে তার লাল-ভ্যারেণ্ডার ভালোবাসার ঝোপে পড়ে রইল গরম টাটকা রক্তে উত্তপ্ত, কিন্তু মৃত সনাতন।

লোক দুটো ফিরে যাচ্ছিল মোটরবাইকের দিকে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ফিরে এসে দুজনে মিলে লাথি মেরে সনাতনের মৃত শরীরটাকে নদীর জলে ফেলে দিল। এত শব্দের মধ্যে সনাতনের জলে পড়ার শব্দটা শুনতেও পেল না ওরা।

তারপরই দৌড়ে ফিরে গিয়ে মোটরবাইক স্টার্ট করে চলে গেল।

পুটুর-পুটুর-পুটুর আওয়াজটা হাওয়ার সঙ্গে আবার উড়তে লাগল। নতুন-পালা লেখা হলো না সনাতনের। শেষের যাত্রায় ভেসে চলল সে তার সাধের নদী বেয়ে। এ নদীর ধারের যে, গাঁ-গঞ্জ, গাছ-গাছালী দেখা হয় নাই কখনও, এবার সকলই দিখে নিবে সে।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই তিন গাঁয়ের লোক এসে নদীর পারে পৌঁছল—। দেখে খুশী হল যে, জল নেমে গেছে। এতদিনের বাঁধ —চিরদিন তাদের বিশ্বাসের দাম দিয়েছে। ওরা জানে, এ বাঁধ কখনও ভাঙবে না।

কাল রাতে নাকি ইরিগেশান ডিপার্টের দুজন লোক এসেছিল মোটর-সাইকেলে বাঁধের অবস্থা দেখতে। কাদের মুখ থেকে বা কার মুখ থেকে কথাটা রটল তা কেউই জানলো না। তবে পুটু-পুটুর শব্দটা কেউ কেউ শুনেছিল। তাই সকলেই কথাটা বিশ্বাস করল।

সনাতন তখনও চিৎ হয়ে ভেসে যাচ্ছিল ভাগীরথীর দিকে।

তার বড় বড় চুল, সুন্দর টান-টান ফরসা শরীর—যেন সুন্দর চিতল মাছ একটা—কোক্‌, ওভেনের বিষে মরে ভেসে চলেছে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। সোনামণি তার মায়ের পাশে মাটির ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল! দুটো হাত জোড়া করে দুই উরুর মাঝে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুমোচ্ছিল সোনামণি। তার খোলা চুল পিঠময় ছড়িয়ে ছিল।

একটা ভাসা-কাঠের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় চিৎ হয়ে ভেসে যাওয়া

সনাতনের শবটা উলটে গেল।

তখন উপুড় হয়ে ভেসে চলল টান টান।

ঘুমের মধ্যে কী যেন বিড় বিড় করতে করতে সোনামণি হঠাৎ চিৎ হয়ে শুলো। মাথার বালিশটাকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। চেপে ধরলো ভীষণ জোরে। তারপর ঘুমের মধ্যেই এক সুন্দর সলজ্জ স্বপ্নে ভেসে চলল। এমন স্বপ্ন সোনামণি আগে দেখেনি কখনও।

যখন সূর্য উঠলো নদীর উপরে—লাল টকটকে একটা সূর্য—তখন পালাকার সনাতন আঁকুড়া দেখতেও পেলো না যে, সমস্ত ভোরের নদী কেমন লাল হয়ে উঠেছে নতুন সূর্যের উষ্ণ লাল আলোয়।

❋

এক নম্বর হারামী, ক্যাপিটল্। ফণী মণ্ডল পাকা-বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসে হুঁকো খাচ্ছিল দূরের নদীর দিকে চেয়ে।

আসল হারামী ক্যাপিটল!

তার নাদুস-নুদুস আতু-আতু ছেলেটা দৌড়ে এসে বলল, জানো বাবা, সনাতন হারিয়ে গেছে। বলছে, সকলে।

একটু থেমে দোতলায় দৌড়ে ওঠার কারণে দম নিয়ে আবার বলল, বলছে না কী, তারে নদীতে নেছে। নেবে না? এত সাহস? ভগমান কী নেই? এত সাহস? হাটের মধ্যে আমাকে থাপ্পড় মারা!

ঠাণ্ডা-মেজাজের ক্যাপিটল ফণী মণ্ডলের রক্ত হঠাৎ মাথায় চলে গেল। সে তার নতুন বৌমার সামনেই ছেলের পেটে এক লাথি মারলো, কোঁত করে।

মুখে বলল, ভাগ্। শালা, কুকুরের বাচ্চা।

পিতৃ-অন্নে লালিত-পালিত, দামড়া, পরনির্ভর, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন ছেলেটা কী কারণে লাথি খেল তা বুঝতে পর্যন্ত না-পেরে ভ্যাবাচাকা মেরে আড়ালে গিয়েই তার বৌ-এর বাতাবী-বুকে কেঁদে পড়ল।

...টলের বাচ্চা, খোদ ক্যাপিটল্ ফণী মণ্ডলের উদ্দেশে দাঁত কিড়মিড় করল।

তারপর ভেলী গুড়ের মস্ত আড়তদারের মেয়ে, তার উনিশ বছরের করমচা করমচা গন্ধের বউকেই শাসিয়ে বলল ঃ শালার ফণেকে শেখাবো আমি : দেখো, মান্তু ! আমি একদিন ঠিক কমোনিস্টো হয়ে যাবো। ক্যাপিটলের দ্যদ হবো।

বুঝবে সেদিন কুকুরের বাচ্চার বাপ।

বড় বড় চুল-ওয়ালা মাথা ও কাটা কাটা পুরুষালী মুখ সমেত সুন্দর দীর্ঘকায় সনাতনকে দামোদর একটা তুরন্ত মোড় নেবার সময় সোনালী নরম ভিজে বালিতে ছুঁড়ে দিয়ে গেল !

এক দল শকুন নতুল-প্যালার পালাকারকে লক্ষ্য করছিল। চক্রাকারে উড়তে উড়তে আসছিল মৃতদেহটার উপরে উপরে। অনেকক্ষণ ধরে। পালাকারের জীবনের যাত্রা শেষ হতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরটার উপর।

শকুনগুলো এবার চুল-চেরা বিচার করবে সনাতনের দোষ-গুণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের।